একক ১৯ ❑ জাতীয় ঐক্যসংক্রান্ত সমস্যা ঃ ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ প্রস্তাবনা

১৯.২ জাতীয় ঐক্যের ধারণার বিবর্তন

১৯.৩ জাতীয় ঐক্যের উপাদানসমূহ

১৯.৪ ভারতে বৃটিশ শাসনের ভূমিকা ও তার প্রভাব

১৯.৪.১ ভারতীয় কৃষক

১৯.৪.২ আদিবাসীসমূহ

১৯.৪.৩ শিক্ষা ও সংস্কার

১৯.৪.৪ যোদ্ধাজাতি সংক্রান্ত ধারণা

১৯.৫ ইতিহাসের বিকৃতি

১৯.৬ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রাজনীতির উৎস

১৯.৬.১ আইনসভার প্রতিনিধিত্বে

১৯.৬.২ চাকুরীক্ষেত্রে

১৯.৬.৩ কৃষিসংক্রান্ত শ্রেণী সম্পর্কে

১৯.৬.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে

১৯.৭ আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা ও অঞ্চলভিত্তিক আনুগত্যের বৃদ্ধি

১৯.৮ সারাংশ

১৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৯.১০ উত্তরমালা

১৯.০ উদ্দেশ্য

জাতীয় ঐক্যের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণের জন্যই এই এককটি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাকেই জাতীয় ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় বলে এই এককে গণ্য করা হয়েছে।

এই এককটি পড়লে আপনি

- সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার ধারণা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- বিশেষ করে গত শতাব্দির ঘটনাবলীর মাধ্যমে এই ধারণা দু'টির বিবর্তন ধারার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

- ভারতীয় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে এবং ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

১৯.১ প্রস্তাবনা

ভারত বিভিন্ন জনজাতি সমন্বিত একটি দেশ। বহু জনজাতি এদেশে রয়েছে। এগুলির আকার এবং প্রকারে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন রয়েছে কোন বিশেষ এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র আকারের জাতি অথবা উপজাতি এবং ভাষা বা ধর্মভিত্তিক বৃহদাকারের জনজাতি। কোন বিশেষ জনজাতি যে অত্যন্ত প্রভাবশালী, তা নয় এবং বিভিন্ন জনজাতিকে একে অপর থেকে পৃথক করার মাপকাঠিও তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। এমতবস্থায় ভারতীয় ঐক্য সংক্রান্ত ধ্যানধারণা উপস্থাপনার সমস্যা যে যথেষ্ট কঠিন তা অস্বীকার করা যায় না। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত লেখাপত্রে জাতীয় সংহতির প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং এর উদ্দেশ্য হ'ল প্রত্যেকটি রাজ্যের সমস্ত মানুষকে একটি অভিন্ন পরিচিতির ভিত্তিতে আবদ্ধ করা এবং অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও কর্তব্য যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় তার পথ প্রশস্ত করা।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু রাজনৈতিক সংহতির সঙ্গে সমার্থক নয়। কারণ, রাজনৈতিক সংহতির উদ্দেশ্য হ'ল কোন একটি রাজনৈতিক এককের (যেমন একটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) ভূখণ্ডগত সংহতিসাধন। উক্ত এককের কৃষ্টিকে ভারতের প্রধান অথবা কোন মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার করে ফেলা নয়। উপরোক্ত দু'টি দৃষ্টভঙ্গীর বৈধতার প্রশ্ন না তুলেও ওটা জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী এককভাবে অথবা যৌথভাবে কতটা আমাদের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার সাহায্য করেছে? কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা, ধর্ম, জাতপাত, জনজাতি, অঞ্চল প্রভৃতি প্রশ্নে কায়েমি স্বার্থের কারণে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হতে বসেছে। এই এককে জাতীয় ঐক্যের কোণ থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার সমস্যার আলোচনা করা হবে।

১৯.২ জাতীয় ঐক্যের ধারণার বিবর্তন

একটা প্রশ্নে বিদ্বজ্জনমন্ডলীতে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। সেটি হ'ল এই যে, 'ভারত' বলতে কি ভারতে সমস্ত নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সার্বিক সভ্যতা বোঝায়? 'ভারত' কী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্থে বাস্তব? অথবা, 'ভারত' বলতে কি বোঝায় একটি বিশিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি সমন্বিত অঞ্চল? ১৮৮০-এর দশক থেকে এই বিতর্কের সূচনা বেশ ভালভাবেই হয়েছে। জন ষ্ট্র্যাচি তাঁর 'ভারত' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে ভারত সম্পর্কে যা অবশ্য জানা উচিত তা হ'ল :

''ভারত' কোনদিন ছিলও না, নেইও। এমনকি ভারত নামক এমন একটি দেশের কথাও আমরা বলতে পারিনা। কারণ ইউরোপীয় ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটে দেখলে ভারতের প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্মীয় ঐক্য ছিল না।"

স্পষ্টত, ব্রিটিশরা ভারতে আঞ্চলিকতার উপরেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল। পক্ষান্তরে ডি. আর. ভান্ডারকর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং আরও অনেক জাতীয়তাবাদী লেখনগণ জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত ঐক্য সম্বলিত এক 'ভারত' ছিল এবং চিরদিনই রয়েছে। ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁর Oxford History

of India গ্রন্থে এই দুই মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতে রয়েছে 'ঐক্যের মধ্যে বহুত্ব'। জওহরলাল নেহরু ভারতের ঐক্যের স্বতন্ত্র ভিত্তির স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে স্মিথের এই উক্তির প্রয়োগ করেছেন।

১৯.৩ জাতীয় ঐক্যের উপাদানসমূহ

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার আগে আধুনিক অর্থে একটি জাতি হিসেবে ভারতের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দীর্ঘ ইতিহাস ভারতের রয়েছে এবং তার ফলে ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে এদেশের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের ধারণা শক্তিশালী হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্নিহিত কাঠামোর যে বিষয়গুলি ভারতকে একটি দেশ থেকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত হ'তে সাহায্য করেছে সেগুলি হল :

- ব্রিটিশরা সমস্ত ভারতীয় ভূখণ্ডকে একটি অভিন্ন প্রশাসন-ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসেছিল।
- একটি অভিন্ন আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রচলনে ভারতের ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।
- রেলপথ, তারবার্তা ব্যবস্থা, আধুনিক ডাক-ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মোটর চলাচল ব্যবস্থার মত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচলনে ভারতের ঐক্যসাধনের প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে একদিকে যেমন গ্রামীণ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বিনষ্ট হয়েছিল, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-ব্যবস্থার বৃদ্ধির ফলে জাতীয় চেতনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই জাতীয় চেতনা ভারতের ঐক্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারত। 'উঠতে পারত' এজন্য বলা হচ্ছে যে, ব্রিটিশ শাসন নিজের অজান্তে ভারতীয় ঐক্যের পথ সুগম করলেও ব্রিটিশরাজের স্বেচ্ছাকৃত 'বিভেদ-ভিত্তিক শাসনের' নীতির মাধ্যমে ইচ্ছা করেই সেই ঐক্যের ভিত্তিতে চিড় ধরানো হয়েছিল।

অনুশীলনী ১

১) নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল ? ✓ অথবা X চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) জন স্ট্র্যাচি ভারতবর্ষকে বহুকাল ধরে বর্তমান এক জাতিরূপে বর্ণনা করেছেন।

(খ) সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ভারতবর্ষের।

(গ) ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান।

২) ভারতবর্ষ কি এক জাতি সেই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কদের মতামত কী ছিল ? পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর লিখুন।

....

....

....

....

....

১৯.৪ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা ও তার প্রভাব

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ব্রিটিশরা ভারতের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণকে নিজেদের স্বার্থেই কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সবসময়েই এক ছিল না। ব্রিটেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে ভারতেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, নীতি এবং এগুলির প্রভাব পরিবর্তিত হয়েছে।

১) ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে প্রশাসন, বিচার, পরিবহন ও যোগাযোগ, কৃষি অথবা শিল্পোৎপাদন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বা চিন্তার জগতে কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি।

২) ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় পর্যায়েই দেখা গেল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর ঘটান হ'ল। পুরোন ব্যবস্থা অনুসরণ করে নূতন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করা, অর্থাৎ ব্রিটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষা করা, সম্ভব ছিল না। এজন্যই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় প্রশাসনে, অর্থনীতিতে ও সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর নীতি অবলম্বন করা হয়। এজন্যই নূতন নূতন আইন-কানুন সম্বলিত একটি নূতন ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই নূতন আইন-কানুনগুলির মধ্যে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) এবং দেওয়ানী আইন (Indian Civil Procedure Code) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নূতন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য অতিরিক্ত লোকজনের (ভারতীয়) প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেজন্যই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা হয় এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা হয়। এসময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদ এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসকবর্গের মধ্যে একটু উদারনৈতিক মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ স্বশাসনের বিষয়ে ভারতীয়দের তালিম দেওয়ার প্রশ্নে জল্পনা কল্পনার সূত্রপাত হয়।

৩) বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় পর্যায় মোটামুটি একই সময়ের ঘটনা। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান শিল্পোন্নত দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলেই বাজার এবং উপনিবেশ দখলের লড়াই সমস্ত পৃথিবী জুড়েই শুরু হয়। স্বভাবতই, এই পর্যায়ে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বন করে। অর্থাৎ স্বশাসনে ভারতীয়দের প্রশিক্ষণের ভাবনা-চিন্তা শিকেয় তুলে রাখা হয় এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন পাকাপাকিভাবে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে নূতন নীতি অবলম্বন করা হয়। এতে নিম্নোক্ত বিষয় দু'টি লক্ষ্য করা যায় :

(ক) ভারতে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার সূত্রপাতের ফলে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলশ্রুতিস্বরূপ ভারতে যে সামাজিক শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে, সেই শক্তি ব্রিটিশ ভারতের আধুনিকীকরণের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।

(খ) সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভয়ে ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ (মূলতঃ ধর্মভিত্তিক) সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করে। কারণ, ব্রিটিশরাজের ধারণা হয়েছিল যে এ ধরণের বিভেদের নীতি কার্যকর করা গেলে ভারতে একটি সংহত এবং শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের সম্ভাবনাকে শুরুতেই খর্ব করা যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে ব্রিটিশরাজ ভারতকে সম্পূর্ণরূপে উপনিবেশে পরিণত করে। একটি শীর্ষস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে ব্রিটেনের উন্নয়ন এবং ভারতীয় অর্থনীতির অনুন্নত অবস্থা হাত ধরাধরি করেই এগোয়। বস্তুত, একে অপরের পরিপূরকই ছিল। ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ শিল্পপতি, ব্রিটিশ লগ্নী এবং অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের স্বার্থে রাজপ্রচলিত সমস্ত পদক্ষেপই ভারতকে একটি অত্যন্ত অনুন্নত ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পর্যবসিত করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপের মধ্যে যেটি ভারতীয় জনসাধারণকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করেছিল সেটি ছিল জমির খাজনা আদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।

১৯.৪.১ ভারতীয় কৃষক

খাজনা আদায় ও জমির স্বত্বের স্থায়িত্বসংক্রান্ত যে দু'টি প্রধান ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল তার একটি ছিল জমিদারী প্রথা (পরবর্তীকালে খানিক পরিবর্তনসহ এটি মহাজনী ব্যবস্থা নামে পরিচিত হয়েছিল) এবং অপরটি ছিল রায়ত ব্যবস্থা।

উপরোক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও চাষীর সমৃদ্ধির কথা ভাবা হয়নি। এই দ্বৈত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, জমির স্বত্বাধিকারী এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টির কথা ভাবা হয়েছিল, যে শ্রেণী ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তির স্বার্থে ব্রিটিশরাজ নির্ভর হতে বাধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে ভারতের উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

এই দুই ব্যবস্থাতেই বস্তুত ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের। জমিদারী প্রথার ফলে আগের খাজনাদায়ী কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিক হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা গ্রামীণ সমাজের শিরোমণি হয়ে বসেছেন এবং চাষীদের ইচ্ছামত প্রজা বানানো হয়েছে। তবে এই নতুন শ্রেণীর জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে প্রতি বৎসর যে কর আদায় করত তার একটা অত্যন্ত বড় অংশ ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হ'ত।

রায়ত ব্যবস্থায় সরকার সরাসরি চাষীদের থেকে খাজনা আদায় করত। যদিও চাষীরা ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিক ছিলেন, তবু অত্যন্ত উচ্চহারে খাজনা দিতে হ'ত বলে তাঁদের মালিকানা প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। উপরোক্ত দু'টি ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ সরকারই জমির আসল মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার সরাসরি কুফল হিসেবে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই মহাজনদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল এবং তাঁরা নিজেদের স্বার্থে বিচারবিভাগ ও প্রশাসনকে চোরাপথে প্রভাবিত করতেন। জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল। উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সেগুলি হ'ল - জমিদার, দালাল, মহাজন। এই শ্রেণীগুলির অবস্থান ছিল সমাজের উপরতলায়। সমাজের নীচুতলায় যে শ্রেণীগুলি আত্মপ্রকাশ করে সেগুলি হ'ল - প্রজা (যাঁদের জমিদাররা ইচ্ছা হলেই প্রজা বানাতে পারতেন), ভাগচাষী এবং জমিহীন কৃষিশ্রমিক। এতে করে শুধু যে শোষণ চরম পর্যায়ে পৌঁচেছিল তাই নয়, এর ফলে ভারতের গ্রামীণসমাজ খণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

১৯.৪.২ আদিবাসীসমূহ

ব্রিটিশ শাসন এবং কৃষিকে বাণিজ্যভিত্তিক করার নীতির ফলে বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে মহাজন, ব্যবসায়ী,

জমি দখলদারী এবং ঠিকাদারদের অনুপ্রবেশের প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এইসব লোকেরা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরে সমতলভূমি থেকেই এসেছিল। আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলনে আদিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ যথেষ্ট ছিল। তবে মহাজন, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতি শোষক শ্রেণীর অনুপ্রবেশের ফলে আদিবাসীদের নিরুদ্বেগ এবং সরল জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হওয়ায় আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এদের অনুপ্রবেশের কারণে আদিবাসীদের মধ্যে স্বভাবতই তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৮৭০-এর পর থেকে দেখা যায় যে, অধিকতর আয়ের স্বার্থে বনাঞ্চলগুলিকে কড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নিয়ে আসা হয়। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ১৮৬৭ সাল থেকেই ঝুমচাষ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রিত অথবা নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ এ ধরনের চাষ ব্যবস্থায় লাঙল অথবা গরু-মহিষের প্রয়োজন পড়ত না বলে এর উপর আদিবাসীভুক্ত অত্যন্ত দরিদ্র মানুষদের প্রচণ্ড নির্ভরতা ছিল। কাঠ ও চারণভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে সরকার বনজ সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না। অসীম সাহস এবং চরম ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত প্রতিবাদ সম্ভবও ছিল না। কারণ, এ ধরনের প্রতিবাদ দমনে প্রশাসন চূড়ান্ত দমন-পীড়নের পন্থা অবলম্বন করে। এ প্রসঙ্গে ১৮২০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত কোলবিদ্রোহ, ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৭৯ সালের রম্পা বিদ্রোহ এবং ১৮৯৫ থেকে ১৯০১ সালে মুণ্ডা বিদ্রোহ সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাই হোক, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে এদেশে বহুরকমের বিভাজন সৃষ্টি হয়। এ ধরণের বিভাজন ঘটে আঞ্চলিক অর্থে, সাম্প্রদায়িক অর্থে, উপজাতি ও অনুপজাতির অর্থে, উঁচুজাত-নীচুজাতের অর্থে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত অর্থে। স্পষ্টতই, এ ধরণের নানারকম বিভাজনের ফলে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মধ্যে ভারসাম্য সম্ভব ছিল না। যা সম্ভব ছিল তা হ'ল, চরম অসাম্য এবং অসমকক্ষতা। ভারতীয় সমাজে এরূপ বিখণ্ডীকরণজনিত অসাম্যের ফলে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ মোটেই সহজ ছিল না। স্বভাবতঃই, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের সাথে জাতপাত, লিঙ্গ ও ধর্মভিত্তিক প্রভেদ দূরীকরণের ভিত্তিতেই ভারতীয়দের আন্দোলন সামিল করা সম্ভব ছিল।

১৯.৪.৩ শিক্ষা ও সংস্কার

পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে আধুনিক ধ্যানধারণা ভারতে প্রবেশ করে এবং এর ফলে ভারতীয়দের চিন্তার জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে গণতন্ত্র, জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা, যুক্তিবাদ, মানবিকতাবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কিন্তু এটা চাননি। ১৮১৩ সাল থেকে ভারতে অত্যন্ত সীমিতভাবে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক ও সামাজিক শিক্ষা অবহেলার শিকার হয়। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষা ভারতে জাতীয়তাবাদ প্রসারের উৎস্বরূপ ছিল বলে পরবর্তীকালে ভারতীয়দের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ শাসককুল বৈরী মনোভাব পোষণ করে। ফলে উপনিবেশিক স্বার্থের কথা মনে রেখেই ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো, প্রকৃতি, লক্ষ্য, প্রণালী এবং পাঠ্যবিষয় স্থির করা হয়। ঔপনিবেশিক চরিত্র সম্বলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার সারাংশ নীচে দেওয়া হল :

- আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার উন্নয়নে অবশ্য প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষা সর্বৈবভাবে অবহেলিত হয়।
- শিক্ষার মাধ্যমস্বরূপ ভারতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর ফলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই এই ব্যবস্থার ফলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের

উচ্চস্তরের লোক (এলিট) এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর সামাজিক, ভাষাগত এবং কৃষ্টিগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়। শিক্ষার সুযোগ শহরবাসী মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়।

শুরুতে ঔপনিবেশিক প্রশাসন সমাজ-সংস্কারের কথা ভাবলেও পরে পিছিয়ে আসে। বস্তুতঃ এধরনের প্রশাসনের সহজাত রক্ষণশীলতা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কারণেই সমাজ-সংস্কারের কথা শেষ পর্যন্ত আর ভাবা হয়নি। শুধু তাই নয়, বৃটিশ প্রশাসন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল এবং অবক্ষয়ী ব্যক্তিদের সমাজ সংস্কার রোধের প্রচেষ্টায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করার নীতিই প্রশাসন অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, এধরনের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯.৪.৪ যোদ্ধা-জাতি সংক্রান্ত ধারণা

ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যের ফাটল ধরাতে ব্রিটিশরাজ অন্যান্য পথও বেছে নেয়। যেমন, ভারতের বিভিন্ন জাতিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যোদ্ধাজাতি এবং যোদ্ধা নয় এমন জাতিতে। ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ এবং বিভিন্ন বাহিনীর (রেজিমেন্ট) গঠন আঞ্চলিক বিবেচনার ভিত্তিতে করার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যের বীজই বপন করা হয়। যেমন, পৌরুষ ও সাহসের অভাব এই অজুহাতে বাঙ্গালীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে টি.বি. ম্যাকিন্‌লি তাঁর Critical and Historical Essays নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> "শারীরিক শক্তির নিরিখে বাঙালীরা অত্যন্ত দুর্বল, এমনকি পৌরুষহীন। তারা সর্বক্ষণই হাঁসফাঁস করে, বসে বসে কাজ করাই তারা পছন্দ করে, তাদের হাত-পা নড়বড়ে এবং চলাফেরা ঢিলেঢালা। ইতিহাসের নানা যুগে বাঙালীরা তাদের থেকে আরও শক্তিশালী জাতিদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে। বাঙালীদের শারীরিক গঠন এবং তাদের পরিস্থিতি এমনই যে তাদের পক্ষে সাহসী স্বাধীনচেতা এবং সত্যবাদী হওয়া সম্ভব হয়নি।"

বলাই বাহুল্য যে, বাঙালীর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য বিদ্বেষের পরিচায়ক এবং সর্বৈব ভিত্তিহীন। এরূপ পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার ভিত্তিতেই শিখ, জাঠ, রাজপুত এবং মারাঠা বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এর ফলে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী একটি (ভারতীয়) জাতীয় বাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি; বরং বিভিন্ন বাহিনী, বিভিন্ন অঞ্চল, জাত এবং সংকীর্ণ স্বার্থের প্রতিভূস্বরূপই বিবেচিত হ'ত। তবে পরিতাপের কথা হ'ল এই যে, স্বাধীনতার পরেও ব্রিটিশরাজ প্রচলিত এই জঘন্য নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে অত্যন্ত সাম্প্রতিককালে ব্রিটিশ প্রচলিত এধরনের নীতি পরিবর্তন করা যায় কিনা তা নিয়ে নূতন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগ থেকেই 'বিভাজনের ভিত্তিতে শাসনের নীতিই ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসননীতির মূলসূত্র ও সর্বব্যাপী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নীতির ফল ছিল নিম্নরূপ :

ভারতীয়দের বিভিন্ন ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সর্বৈব পৃথক এবং সংহত গোষ্ঠী বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া, ভারতীয়দের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্বার্থ ও জাতের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। শুধু তাই নয়, এরকম এক একটি গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শক্তিস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশরাজ প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতির প্ররোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে বাঙালী বনাম বিহারী বা বাঙালী বনাম পাঞ্জাবী বিরোধ উস্কে দেওয়া হয়। তাছাড়া ভাষা, জাত, কোন একটি জাতি যোদ্ধা অথবা যোদ্ধা নয় প্রভৃতির ভিত্তিতেও বীজ বপন করা হয়। অর্থাৎ,

ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিতে ব্রিটিশরাজ সমস্ত সম্ভাব্য পন্থাই অবলম্বন করেছিল।

অনুশীলনী ১

১) আদিবাসীদের উপর ভারতে ঔপনিবেশিক শাসক অনুসৃত নীতির প্রভাব আলোচনা করুন। দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২) নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল ? ✓ অথবা ✗ চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির ফলে ভারতে এলিট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

(খ) 'বিভাজনের ভিত্তিতে শাসনের' নীতির কারণেই ভারতীয়দের যোদ্ধা নয় জাতিতে ভাগ করা হয়েছিল।

(গ) ভারতীয় ঐক্য সংহত করার স্বার্থেই ভারতীয়দের যোদ্ধাজাতি ও যোদ্ধা নয় এমন জাতিতে ভাগ করা হয়েছিল।

(ঘ) ব্রিটিশরাজ প্রাদেশিকতাকে উৎসাহিত করেছিল।

৩) ব্রিটিশরাজ সমাজ সংস্কারদের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল কেন ? পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

১৯.৫ ইতিহাসের বিকৃতি

ভারতীয় ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর উদ্দেশ্য সমস্ত সম্ভাব্য পথ ব্রিটিশরাজ অবলম্বন করে। ব্রিটিশরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে স্বৈরাচারী শাসকগণই চিরকাল ভারত শাসন করেছে। আসলে এধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্রিটিশরা বোঝাতে চেয়েছে যে :

প্রথমত, ব্রিটিশরাজ আইনের ভিত্তিতে শাসনের মাধ্যমেই সঙ্গতভাবেই স্বৈরাচারে লিপ্ত হতে পারত।

দ্বিতীয়ত, ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের ফলে হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনকালে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে বিভক্ত করার লক্ষ্যই ছিল পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বিভেদ ও পার্থক্য বৃদ্ধি করা। ভারতের ইতিহাসের এরূপ বিকৃত, ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এরূপ অপব্যাখ্যার কারণেই ভারতে ব্রিটিশ আমলে সাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল। স্কুলে ও উচ্চশিক্ষার স্তরে এই বিকৃত ইতিহাস পঠনপাঠনের কারণে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় ইতিহাসের সম্প্রদায়ভিত্তিক অপব্যাখ্যা প্রথম সাম্রাজ্যবাদী গ্রন্থকারগণ করেন। পরে অন্যরাও অনুরূপ অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে ভারতে মুসলিম শাসন সম্পর্কে এইচ্.এম্. ইলয়টের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক :

> "ভারতে মুসলিম শাসন সম্পর্কে বলতে গেলে এটা বলতেই হয় যে, মুসলমানদের মত থেকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করার জন্য হিন্দুদের খুন করা হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করা হয়েছে, তাঁদের দেবদেবীর মূর্তি অপবিত্র করা হয়েছে, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, হিন্দু মেয়েদের বলপূর্বক মুসলমানরা বিবাহ করেছে, হিন্দুদের বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করান হয়েছে, হিন্দুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং পাইকারী হারে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে। কামুক ও পানাসক্ত অত্যাচারী মুসলমান শাসকবর্গ হিন্দুদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অত্যাচার উপভোগই করতেন।"

ইলিয়ট অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, এসব লেখার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গ্রহণযোগ্যতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে ভারতীয় প্রজাদের প্রভাবিত করা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিদের প্রাক-ব্রিটিশ যুগের অর্থাৎ মুসলমান শাসনের রূঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা ও তাঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমালোচনা থেকে নিরস্ত করা।

তবে পরিতাপের কথা এই যে, অনেক ভারতীয় ইতিহাসবিদ সচেতন অথবা অ-সচেতনভাবে তাঁদের ইতিহাস চর্চায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরা তথ্যভিত্তিক ইতিহাসচর্চা বর্জন করে ব্রিটিশদের চোখেই ভারতে মুসলিম শাসন অবলোকন করেছেন অথবা হিন্দু শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খার জয়গান গেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, স্যার যদুনাথ সরকারের লেখা (হিস্ট্রি অব আওরঙজেব, অষ্টম খণ্ড) থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক :

> "সমস্ত অমুসলিমদের ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করা এবং সমস্তরকমের বিরুদ্ধ মত গুঁড়িয়ে দেওয়াই ভারতে মুসলিম শাসনের লক্ষ্য ছিল। সমাজে যদি কোন ইসলামধর্মে অবিশ্বাসীর অস্তিত্ব নিরুপায় হয়েই স্বীকার করা হ'ত, তবে মুসলমানশাসিত সমাজে অমুসলমানদের অস্তিত্ব চিরকালীন নয় বলেই ধরে নেওয়া হ'ত। অতএব এঁদের ধর্মান্তরিত করা উদ্দেশ্য এঁদের ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট নানারূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার

সম্মুখীন হতে হ'ত। এবং এঁদের ধর্মান্তরণের পথ সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে রাজকোষ থেকে অর্থব্যয়ের মাধ্যমে এঁদের জন্য নানারূপ প্রলোভন সৃষ্টি করা হ'ত।"

অনুরূপভাবে এ.এল. শ্রীবাস্তব তাঁর 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ১০০০-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ' গ্রন্থে লিখেছেন :

"ভারতেও মুসলমানরা যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে দখল করার তুর্কী নীতি অবলম্বন করেছিল। এঁদের শাসন সাড়ে তিনশত বৎসর ধরে চলেছে এবং সেসময়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে খুন করা হয়েছে, যুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু-নারী ও শিশুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং অনেককে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়েছে। ভারতে মুসলিম শাসনকালে হিন্দুরা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। মুসলমান শাসনে তাঁরা যে শুধু শাসক, মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষের পদ হারিয়েছিলেন, তাই নয়, তাঁরা মুসলমানদের ঘৃণার শিকার হয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে এরকম বিকৃত ইতিহাস শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে তখনও অনেকে অবহিত ছিলেন। গান্ধীজী বলেছেন যে, স্কুল এবং উচ্চশিক্ষাস্তরে এধরণের বিকৃত ইতিহাসের পঠন-পাঠন চলতে থাকলে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন কখনই সম্ভব হবে না। ১৯৩২ সালে দানাপুরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের 'মুখবন্ধ' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত উদ্ধৃত করা যাক :

"ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার স্বার্থে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে অতীত সম্পর্কে যথার্থ ধারণা অবশ্য প্রয়োজন। অতএব একথা অনস্বীকার্য যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের পথে ইতিহাসের পথে ইতিহাসের বিকৃতি দূরীকরণই প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।"

ইতিহাসের সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির উপর এর অশুভ ছায়াপাত ঘটেছিল।

অতএব দেখা যায় যে, এখনও কিছু কিছু বিশ্লেষক এবং রাজনীতিক মনে করেন যে, ভারতের বর্তমানকালের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎস অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। তাঁরা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এই বীজ ভারতে মুসলিম শাসনকালেই বপন করা হয়েছিল। এটা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা অতীতের অবদান নয়। অধ্যাপক বিপানচন্দ্র বলেছেন :

"সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শ বর্তমানকালেরই। তবে অতীতের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ইতিহাস থেকে কিছু কিছু উপাদান এর মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই বর্তমানকালের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আলোচনার রীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করা হয়েছে।"

১৯.৬ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রাজনীতির উৎস

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবণতা এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সম্পর্কে সুপ্ত ধারণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং যেটুকু পারস্পরিক সদিচ্ছা ছিল তা নূতন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আবর্তে হারিয়ে যায়। অতএব দেখতে পাই

যে, সবচেয়ে বড় বড় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে এই শতাব্দির প্রথমার্ধে (১৯০৬-৭, ১৯১৮, ১৯২৬ ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে)।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। বিপানচন্দ্রের মতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা মাঝে মাঝে জাগ্রত হয়ে থাকে এবং তাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, এবং এতে মধ্যবিত্ত ভূস্বামীগণ এবং আমলারা লিপ্ত হয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রাজনীতি বিযুক্ত নয়। কারণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জনক। গত একশ বৎসরের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফসল হ'ল সাম্প্রদায়িকতা বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে।

ব্রিটিশরাজও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভাজনের নীতি অনুসরণ করেছে। এটা ঠিক নয় যে, মুসলিম শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য ও উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু সে উত্তেজনা ও মতপার্থক্য ছিল মূলত শ্রেণীগত। সেই পার্থক্য শাসক ও শাসিত শ্রেণীর, উৎপাদক ও যারা ভোগ করতেন তাঁদের, ভূস্বামী ও প্রজার। এর প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমানরা চিরকালই একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একই ধর্মবিশ্বাস দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দেখা যায়; যেমন, সত্যপীর, মানিকপীরের ভক্ত দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই ছিল। অনেক মুসলমান কবি ছিলেন যাঁরা বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ মুর্তজা, চাঁদ কাজী সানুর ও লাল মহম্মদ অন্যতম। কিছু মুসলমানের মধ্যে হিন্দুদের দেবদেবী সম্পর্কে ভক্তি ছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর সময় তিনি 'মুক্তির' আশায় দেবী কীরিটীশ্বরীর চরণামৃত পান করেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারই তাঁকে ঐ চরণামৃত পান করান। আবার একথাও ঠিক যে, ভারতে ব্রিটিশযুগে দেশের প্রতি আনুগত্যের চেয়েও ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রাধান্য পেয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা যায়।

১৯.৬.১ আইনসভার প্রতিনিধিত্বে

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে আইনসভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ব্রিটিশরাজের প্রশ্নে ব্রিটিশরাজের নীতির ভূমিকা সমধিক। ১৯০৯ সালের আইনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী স্থির করা হয়েছিল। এর তাৎপর্য অবহেলা করা যায় না। এই আইনের ফলে মুসলমানরা তাঁদের জন্য পৃথকীকৃত নির্বাচনক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছামত প্রার্থীকে (প্রার্থীর ধর্ম যা-ই হোক) ভোট দিতে পারতেন, আবার সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গেও ভোট দিতে পারতেন। ১৯১৯-এর আইনে এই অবস্থার আরও অবনতি হয়। কারণ এক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু ভোটার তাঁদের পৃথক নির্বাচনক্ষেত্রে শুধু তাঁদের নিজেদের ধর্মাবলম্বী প্রার্থীদেরই ভোট দিতে পারতেন। ১৯৩০ সালের সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনের ফলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়, কারণ এই প্রতিবেদন বিভিন্ন আইনসভায় সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের উপর এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনক্ষেত্র সংরক্ষণের নীতির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। নির্বাচন প্রথায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের গুরুত্ব আরোপ (weightage) এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ব্রিটিশরাজ প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যান্য অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল।

এ ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের পিছনে দু'টি মৌল ধারণা কাজ করেছে :

(ক) ব্রিটিশরাজের ধারণা ছিল এই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ ভিন্ন

ছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ তাঁদের নিজেদের ধর্মালম্বী প্রতিনিধিরাই রক্ষা করতে পারতেন।

(খ) সংরক্ষণ ব্যবস্থা বর্জিত সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হ'ত। এবং তা শুধু আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেই নয়, উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরিকল্পিতভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংরক্ষিত নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচনক্ষেত্র ও আইনসভা সাম্প্রদায়িক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ছিল।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রণালীই শেষ কথা ছিল না। নির্বাচকদের সম্পত্তিগত ও শিক্ষাগত মাপকাঠিও নির্বাচনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ফলে, নির্বাচনাধিকার মূলত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল এবং এর ফলে, মধ্যবিত্তের স্বার্থ ও রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন, ১৯৩২ সালের গোড়ায় র‍্যামেজে মাক্‌ডোনাল্ড প্রচলিত ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্বাচকমন্ডলীকে হিন্দু, অস্পৃশ্য ও মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক পৃথক ভাবে ভাগ করা হয়েছিল (হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা প্রচলনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু নির্বাচনক্ষেত্রগুলির মধ্যেই তিনি অস্পৃশ্যদের (গান্ধীজী এঁদের 'হরিজন' বলতেন) জন্য বেশী আসন সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছিলেন। এভাবেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত নির্বাচন ব্যবস্থায় সংশোধন করা হয়।

১৯.৬.২ চাকুরীক্ষেত্রে

ঊনবিংশ শতাব্দির শেষদিকে তিনটি প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত চাকুরীর প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। সুফিয়া আহমেদ একটি সমীক্ষায় দেখান যে ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলায় ১৫ টাকা থেকে ১০০০ টাকা বা তদূর্ধ বেতনক্রমে চাকুরীরত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১,২৩৫। পক্ষান্তরে অনুরূপ বেতনক্রমে চাকুরীরত হিন্দু ছিলেন ৮,২৬২। এমনকি মুসলমানপ্রধান পূর্ববাংলায়ও চাকুরীতে ও চাকুরীর সাথে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে চাকুরীক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতির প্রতিফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯.৬.৩ কৃষিসংক্রান্ত শ্রেণী সম্পর্কে

জমিদার ও প্রজাদের বিরোধের প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রকট ছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) এটা ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ জমিদার হিন্দু ও অধিকাংশ প্রজা মুসলমান ছিলেন। ১৯০১ সালে আদমসুমারীতে দেখা যায় যে প্রতি দশ হাজার মুসলমানের মধ্যে ৭,৩১৬ জন কৃষিতে লিপ্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে প্রতি দশ হাজার হিন্দুর মধ্যে ৫,৫৫৫ জন কৃষিতে লিপ্ত ছিলেন। আবার প্রতি দশ হাজার মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ১৭০ জন ভূস্বামী ছিলেন, পক্ষান্তরে অনুরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২১৭। ব্রিটিশ প্রশাসন ইচ্ছা করেই জমিদার-প্রজা সম্পর্কের অবনতির পথ প্রশস্ত করেছিল।

১৯.৬.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে

ইংরাজী-মাধ্যমভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যে সাংস্কৃতিক পরিবৃত্ত গড়ে উঠেছিল। তার

ফলেও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ব্রিটিশরাজকে মুসলিম অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুদের ত্রাতাস্বরূপ দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রের কার্যকলাপের মাধ্যমেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান বিস্তর বিভেদ আরও বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশরাজ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় ইন্ধন জুগিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, এই প্রশাসন সমাজে জাতপাতের বিভেদও বাড়িয়ে তোলে। যে কোন একটি বিশেষ জাতের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধিতেও প্রশাসন সচেষ্ট ছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে জমির সহজলভ্যতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে একজাতের লোকজন অন্যত্র চলে গিয়ে অন্যজাতের লোকেদের সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এ ধরনের সুযোগ প্রায় আর ছিল না। একই সঙ্গে যুক্তপ্রদেশের (UP) ছোটলাট হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান করেন। তিনি প্রচুর হিন্দুকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করেন এবং হিন্দী ভাষার প্রবক্তাদের সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে উর্দু অবহেলিত হয়। এর ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ আরও তীব্র হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবে সরকারী চাকুরীতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণব্যবস্থা দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়। ১৯৩৪-এ এই সংরক্ষণ নীতি সমস্ত প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় (সরকারী) চাকুরীর ক্ষেত্রেই প্রবর্তন করা হয়। এই নীতি বিভিন্ন পেশাদারী শিক্ষাক্রম ও সরকারী কলেজের ভর্তির ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে পৌরকমিটি, জেলা শিক্ষাপর্ষদ, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় গোষ্ঠী পরিচালিত বিদ্যালয় (denominational school) প্রভৃতির সবিশেষ ভূমিকার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

শুধু সরকারী চাকুরী ও শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধিকালে ব্রিটিশরাজ অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করে। এর মধ্যে সরকারী ঠিকা ও খেতাব বিতরণ, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ, পৌর-প্রতিষ্ঠান ও আইনসভাগুলিতে মনোনয়ন উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাঁরা ছড়িয়ে বেড়াতেন ব্রিটিশরাজ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই নেয়নি, অথচ পুলিশ প্রতিবেদন ব্যবস্থা ও গুপ্তচর ব্যবস্থার কোন ঘাটতি ছিল না। জাতীয়তাবাদীদের দমনের জন্য এবং জনসাধারণের যথার্থ দাবি-দাওয়া যাতে ঠিকমত জনসমক্ষে তুলে ধরা না যায় সেজন্য সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও বিভিন্ন ধরনের দমন আইনের ব্যবহার যথেষ্টই করত। অথচ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যাঁরা ছড়িয়ে বেড়াতেন সরকারী দমনযন্ত্র কখনই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হ'ত না। পক্ষান্তরে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের মালিকানাধীন এবং ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্র থেকে উৎসাহ পেয়ে থাকতেন। এই অবস্থাকে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ঘৃতাহুতির নামান্তর বলা চলে। ইংরাজী শিক্ষার কারণে সীমিত সংখ্যক (যদিও পরিবর্ধমান) লোকের সামাজিক উচ্চাকাঙ্খার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। এর ফলেও সমাজে বিভেদ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, ১৯০১ সাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন জাতভুক্ত লোকেদের আদমসুমারী (caste census) প্রচলিত হয়। এভাবে বিভিন্ন জাতের অবস্থান (কোন্ জাত কতটা উঁচু বা নীচু) সম্বন্ধে ভারতীয় জনমানসে বিদ্যমান ধ্যানধারণাকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়। এর ফলে বিভিন্ন জাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ জাতভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তাঁদের স্ব-স্ব জাতের ইতিহাসকে কাল্পনিক গরিমাযুক্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। এর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের জাতের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করা। এই প্রচেষ্টায় সফল নেতৃবর্গ তাঁদের নিজেদের জাতের লোকেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিকল্পে সংগঠিত করায় ব্যাপৃত হন। নিজেদের জাতের জন্য সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াও রাজনৈতিক অনুগ্রহ, সরকারী চাকুরী লাভ এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে প্রচলিত ব্যবস্থার কারণে

এরূপ জাতভিত্তিক সংগঠন ও আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী ৩

(১) ভারতের ইতিহাস বিকৃত করার জন্য ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দশ লাইনের মধ্যে আলোচনা করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(২) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পার্থক্য নির্ণয় করুন। পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

(৩) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ব্রিটিশরাজ কেন এবং কীভাবে করেছিল ? দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১৯.৭ আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা ও অঞ্চলভিত্তিক আনুগত্যের বৃদ্ধি

ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি বিংশ শতাব্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কখনো কখনো এ ধরনের ভাবপ্রবণ মানসিকতার উদ্দেশ্য ছিল বঞ্চিত অথচ শিক্ষিত যুবাগোষ্ঠীর জন্য সরকারী চাকুরীর অভীপ্সা। তবে বহুক্ষেত্রেই এগুলি আঞ্চলিক ভাষাভিত্তিক সাহিত্য ও কৃষ্টিকেন্দ্রিক প্রাদেশিকতার চালিকাশক্তিস্বরূপ কাজ করত (সুমিত সরকার, মডার্ণ ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৪৮)।

১৯১১ সাল নাগাদ মাদ্রাজের তেলেগু অধ্যুষিত জেলাগুলি নিয়ে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবীতে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৩ সাল থেকে বার্ষিক অন্ধ্র সম্মেলন বা অন্ধ্র মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের সম্মেলনে অন্যান্য দাবীর সঙ্গে মাতৃভাষার (তেলেগু) মাধ্যমে শিক্ষার দাবীও উত্থাপিত হয়। যদিও শুধু অন্ধ্র অঞ্চল থেকেই ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবী করা হয়, তবু উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের ফলে নানাবিধ প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যেমন, তামিলনাডুতে ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলনের ফলে ঐ প্রদেশের বিভিন্ন শহরে শুধু 'তামিল সঙ্গম'ই প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, এর ফলে প্রাচীন তামিল মহাকাব্য অধ্যয়নে সমধিক আগ্রহ সৃষ্টিও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলায় ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আন্দোলনের সময় থেকেই আঞ্চলিক ঐক্যের ও অঞ্চলভিত্তিক চেতনার প্রসার ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষার সাহিত্যোপোযোগী সমৃদ্ধি সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের ফলে বাঙালীদের মধ্যে কেবল আঞ্চলিক গর্বই সঞ্চারিত হয়নি, তাঁদের মধ্যে আঞ্চলিক চেতনারও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে।

বিহারে সচ্চিদানন্দ সিংহের নেতৃত্বে পৃথক প্রদেশের দাবীর ফলস্বরূপ ১৯১১ সালে স্বতন্ত্র বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হয়। এই আঞ্চলিক চেতনা কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই এই চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য অবশ্য বিটিশ প্রশাসনের অতিকেন্দ্রিকতা দায়ী। এ ধরণের অতিকেন্দ্রিকতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মোগল আমলে প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণ শুরু হলেও বিজাপুর, গোলকোন্ডা, বিহার, ওড়িশা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ প্রভৃতির আঞ্চলিক সত্তাকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। পক্ষান্তরে, ব্রিটিশরাজ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার মত বড় বড় প্রেসিডেন্সি স্থাপন করে বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীর উপর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আঞ্চলিক চেতনা তীব্র হয়ে ওঠে এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আঞ্চলিক চেতনা তীব্র হয়ে ওঠে এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবিও শক্তিশালী আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে একথা

অনস্বীকার্য যে, এ ধরণের প্রাদেশিক দাবী-দাওয়া জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারার পরিপন্থী ছিল না। বিশেষ করে, সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটে দেখাতে গেলে একথা বলতে হয় যে, ব্রিটিশরাজ 'বিভাজনের ভিত্তিতে শাসনের' নীতি নানাভাবে বাস্তবায়িত করে ব্রিটিশ প্রশাসকরা মুসলমানদের পৃথক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়রূপে গণ্য করার নীতি অবলম্বন করে। যে ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্রিটিশরা এই নীতি অবলম্বন করে তা হ'ল এই যে, ভারতীয় জনসাধারণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং ইউরোপে জাতি (nation) বলতে যা বোঝায় ভারতের ক্ষেত্রে তা' হ'ল ধর্ম। ব্রিটিশরাজ এ-ও ধরে নিয়েছিল ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তাদের স্বার্থ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিকে এভাবে (ধর্মীয়) সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেই বৃটিশরাজ ক্ষান্ত থাকেনি, ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পর্যায় থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ এরকম ব্যাখ্যা প্রচার করেছে এবং এই ব্যাখ্যা ভিত্তিতেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত করেছে।

হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ১৯৩০ সালের সাইমন কমিশনের বক্তব্য এইরকম : "হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মৌল বিরোধ রয়েছে এবং এই বিরোধের প্রতিফলন তাঁদের সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা, তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় রেষারেষিতে ঘটেছে।" অতএব ব্রিটিশরাজ সঙ্গত কারণেই হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থের কথা ভেবেছে এবং অনুরূপ ভাবনার ভিত্তিতেই আইনসভা গঠনে ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

জাতীয় আন্দোলন অবশ্য দুর্বল হয়ে পড়েনি। কখনো কখনো বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রসঙ্গ জাতীয় স্তরে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন কেবল একটি আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবেই বিবেচিত হয়নি। অবশ্য ঐ সময়ে বাংলা জাতীয় আন্দোলনের পুরোধায় ছিল। সমস্ত ভারতের জনসাধারণই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের মূল শক্তিকে চূর্ণ করার ফন্দি এঁটেছিল। ফলে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতই সোচ্চার হয়ে ওঠে।

এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে। ভারতবাসীরা জাতীয় আন্দোলনের থেকে আঞ্চলিক দাবীদাওয়াগুলিকে বেশী গুরুত্ব দিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারত ক্ষোভে ফেটে পড়ত না। অথচ, ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে শুধু পাঞ্জাবীদেরই নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন আশাতীতভাবে সফল হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ও জনসমর্থন ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকেই পাওয়া গেছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন যে গ্লানিময় ঐতিহ্য রেখে গেছে, তাতে করে জাতীয় ঐক্যের ভিত গড়ে তোলা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তবে আশার কথা এই যে, ব্রিটিশরাজ বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে ইন্ধন জোগালেও স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের নীতির মাধ্যমে জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত করায় সচেষ্ট হয়েছে। এ কাজটি অবশ্য সহজ নয় এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পথ মোটেই মসৃণ নয়। ভারতের সমস্ত অঞ্চলের সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারতের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে ছোট ছোট রাজ্য এবং ভারতের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত বড় বড় রাজ্যগুলির মধ্যে বৈষম্য দূর করার স্বার্থেই এটা দরকার। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের স্বার্থে সবার জন্যই শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত। কোন একটি বিশেষ ভাষাকে সবার উপরে চাপিয়ে দেওয়া কাম্য নয়, বরং ভারতের হিন্দী ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। আবার, দক্ষিণ ভারতেও হিন্দী ভাষার চর্চা হওয়া দরকার। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও একে অপরের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে চলার মাধ্যমেই ভাষাজনিত বিভেদ

দূর করা সম্ভব। বলপূর্বক কোন একটি ভাষা সকলের উপর চাপিয়ে দিলে তার প্রতিক্রিয়াও হবে সাংঘাতিক। তাতে করে জাতীয় সংহতিরই সমধিক ক্ষতি হবে। ভারতের সরকারই জাতীয় ঐক্যের অতন্দ্র প্রহরী। এজন্য ভারত সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক, সংকীর্ণ গোষ্ঠীভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক, জাতভিত্তিক বা অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে কেউ যেন নির্বাচনে ফায়দা তোলার মত ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের কারণে উৎসাহদান না করতে পারে। এজন্য ভারতের সমস্ত নাগরিক শিশুকাল থেকেই যাতে জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হন সে চেষ্টায় আমাদের ব্রতী হতে হবে।

অনুশীলনী ৪

(১) ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি কিভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে উৎসাহ প্রদান করেছে ? দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(২) আঞ্চলিক সত্তাসমূহের উদ্ভবকে জাতীয় আন্দোলনের দিক থেকে কীভাবে দেখা হয় ? পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

....

(৩) আঞ্চলিক ও ভাষাগত পৃথক সত্তাগুলি কিভাবে জাতীয় মূল স্রোতের মধ্যে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

১৯.৮ সারাংশ

এই এককে ভারতে জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায়স্বরূপ কিছু সমস্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এবং এটাও বোঝা গেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা এই সমস্যাগুলির অন্যতম। আমরা আরও দেখেছি, ব্রিটিশ শাসন কিভাবে সে সময়ে সুপ্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে উস্কানি দিয়ে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে এবং কীভাবে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক প্রবণতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এক কথায়, ব্রিটিশরাজ বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতিকে অনুসরণ করে লাভবান হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার প্রবণতা স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছে। ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ ও তজ্জনিত সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যার ফলে সাম্প্রতিককালে এ ধরণের প্রবণতার কাঙ্খিত বিবর্তন হয়নি।

কোন একটি সমাজের বিকাশ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক আলোড়নও দেখা দেবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে করে যদি জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট নয় এবং দেশের ভূখণ্ডগত সংহতি বিপন্ন হয়, তবে সেটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতির ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করার স্বার্থে উপযুক্ত নীতি অবলম্বন করতে হবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ বন্ধ করতে হবে। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষদের সমবেত করার কর্মসূচী গ্রহণ করলে জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত হবে।

১৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Wallace, Paul (ed.) : Region and Nation in India, New Delhi.

Sarkar, Sumit : Modern India 1885-1947, New Delhi.

Chandra, Bipan : Communalism in Modern India, New Delhi, 1984.

১৯.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) (ক) x

(খ) ✓

(গ) ✓

২) ১৯.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন। জাতীয়তাবাদী লেখকরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতেরও ঐক্য ছিল। আপনার উত্তরে তা থাকা দরকার।

অনুশীলনী ২

১) ১৯.৪.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) সরল আদিবাসী জীবনযাত্রায় বহিরাগতদের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ।

(খ) সংরক্ষিত বনাঞ্চল প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ঝুমচাষের উপর বিধি-নিষেধ।

(গ) বনজ সম্পদ পূর্বে আদিবাসীরা ভোগ করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বনজ সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

(ঘ) উপজাতি বিদ্রোহ

২) (ক) ✓

(খ) ✓

(গ) x

(ঘ) ✓

৩) ১৯.৪.৩ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকে হবে :

(ক) ব্রিটিশরাজ কর্তৃক প্রচলিত সংস্কারের সীমিত চরিত্র।

(খ) উপনিবেশবাদের রক্ষণশীল প্রকৃতি।

(গ) স্বীয়শক্তি বৃদ্ধির স্বার্থে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলিকে ব্রিটিশরাজের সমর্থন।

অনুশীলনী ৩

১) ১৯.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) এমন ধারণার উদ্রেক করা যে, ভারত চিরকালই স্বৈরাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে।

(খ) অতীতেও যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ছিল তার উপর জোর দেওয়া।

(গ) ভারতে হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের পৃথকীকরণ।

২) ১৯.৬ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার স্বল্পমেয়াদী চরিত্র এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দীর্ঘমেয়াদী চরিত্র।

(খ) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকজন লিপ্ত থাকেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে প্রধানত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন লিপ্ত হয়ে থাকেন।

(গ) সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাতে সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শের ভূমিকা।

৩) ১৯.৬.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) ভারতের জনসাধারণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত। এরূপ ব্রিটিশ ধারণার ভূমিকা।

(খ) বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতি। কেন ব্রিটিশরাজ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক পৃথক নির্বাচনক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং কেন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নানা ধরনের সুযোগসুবিধা দান করত সেসবের ব্যাখ্যায় 'বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের' নীতির ভূমিকা।

অনুশীলনী ৪

১) ১৯.৭ অনুচ্ছেদটি ৫-এ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) বিভেদের ভিত্তিতে শাসনের নীতির ভূমিকা।

(খ) ব্রিটিশ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সমাজের ব্যাখ্যা।

(গ) যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির বিরোধিতা করেছেন ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁদের নির্মমভাবে দমন করেছেন। যেমন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের দমন।

২) ১৯.৭ অনুচ্ছেদটি (তৃতীয় অংশ) দেখুন। আপনাকে দেখাতে হবে কী করে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল :

(ক) বঙ্গভঙ্গ।

(খ) ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসনিক পুনর্গঠন।

(গ) কিভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

৩) ১৯.৭ অনুচ্ছেদটির সর্বশেষ অংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

(ক) ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভূমিকা।

(খ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দূরীকরণ।

(গ) বিভিন্ন ভাষার উন্নয়ন এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সহযোগিতামূলক বোঝাপড়া।

(ঘ) বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিভেদকামী প্রবণতা অথবা কৃষ্টিগত পার্থক্য যাতে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ কাজে লাগাতে না পারেন সে বিষয়ে স্বাধীন ভারতের সরকারের নজর রাখা।

(ঙ) বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির প্রতিরোধে শিক্ষার ভূমিকা।

একক ২০ ❑ জাতীয় ঐক্যের সমস্যা, জাতপাত ও আদিবাসী

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য

২০.১ প্রস্তাবনা

২০.২ জাতপাত ব্যবস্থা

২০.৩ ঔপনিবেশিক আমলে জাতপাত ব্যবস্থা

২০.৩.১ জাতপাত প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নীতি : বিখণ্ডায়নের স্বরূপ

২০.৩.২ ব্রিটিশ শাসনে সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থা

২০.৩.৩ জাতপাত সচেতনতা ও সংস্কৃতায়ন

২০.৪ স্বাধীন ভারতে জাতপাত

২০.৪.১ জাতপাত ও নির্বাচনী রাজনীতি

২০.৪.২ জাতপাতের রাজনীতিকরণের ফলাফল

২০.৫ আধুনিকীকরণ, জাতীয় সংহতি এবং জাতপাত

২০.৬ আদিবাসী সংস্কৃতি : বিবিধ রীতি ও সমস্যা

২০.৬.১ ভারতবর্ষে আদিবাসী জনসংখ্যা

২০.৬.২ আদিবাসী গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য

২০.৬.৩ আদিবাসী ভাষাসমূহ

২০.৬.৪ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ও আদিবাসী

২০.৬.৫ আদিবাসী কৃষকদের সমস্যা

২০.৭ নগর পরিমণ্ডলে আদিবাসী

২০.৭.১ শিল্পায়ন ও আদিবাসিত্ব হনন

২০.৭.২ মুদ্রা প্রচলন ও শিক্ষার প্রসার

২০.৭.৩ আদিবাসী মানুষদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন

২০.৮ ভারতে আদিবাসীদের বিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৮.১ সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৮.২ আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৮.৩ সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী

২০.৯ সারাংশ

২০.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২০.১২ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ হতে পারে :

- জাতপাত ব্যবস্থার ব্যাখ্যা এবং ঔপনিবেশিক ও স্বাধীন ভারতে তার রাজনীতিকিরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ।
- জাতপাত ব্যবস্থার রাজনীতিকিরণ ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সামাজিক ফলাফলের বর্ণন।
- ভারতবর্ষের আদিবাসীদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক রীতি এবং তাদের নানা সমস্যার অনুধাবন।
- আদিবাসীদের সমাজ জীবনে নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবগুলি সনাক্তকরণ।
- জাতীয় জীবনে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত নানা দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ।

২০.১ প্রস্তাবনা

এই অংশটি শুরু হচ্ছে ভারতের জাতপাত ব্যবস্থার বর্ণনার মাধ্যমে। এখানে জাতপাত-ব্যবস্থাগত অসাম্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে; ঔপনিবেশিক আমলের জাতপাত-আদর্শ এবং স্বাধীনতা-উত্তর নির্বাচনী রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া এখানে তপশীলভুক্ত জাত ও অনগ্রসর শেণীভুক্তদের নানা ধরণের ক্ষোভ-প্রতিবাদের কথা এবং তার প্রকাশ হিসেবে বিভিন্ন জাতপাত সংক্রান্ত আন্দোলনের কথা আলোচিত হয়েছে।

আদিবাসীদের নানাপ্রকার জাতিগোষ্ঠীগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক চালচিত্রের কথা এই এককের দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে। পরিবেশগত ভারসাম্যের অভাব, ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি সমস্যাও এই এককে আলোচিত হয়েছে। আদিবাসী সমাজে নগরায়নের ফলে সমাজ পরিবর্তনজনিত ফলাফলগুলি আলোচিত হয়েছে। সব শেষে, আদিবাসী সমাজের বিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যালোচনা হয়েছে।

২০.২ জাতপাত ব্যবস্থা

জাতপাত হ'ল বৈষম্যসৃষ্টিকারী ব্যবস্থা। জন্মগত অবস্থান ও পেশার কলুষতা এবং বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে জাতপাত ব্যবস্থাকে সমর্থন জানানো হয়। জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেবল যে সম্পদগত, উপার্জনগত ও ক্ষমতাগত বৈষম্য রয়েছে তা নয়, কোন কোন গোষ্ঠীর অধিকতর বিশুদ্ধ অবস্থানের অনুমানের ভিত্তিতে জাতপাতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিযুক্তকরণ প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যাবে। এইসব উপাদানের ভিত্তিতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক স্তর নির্ধারিত হয়।

ক্রমোচ্চ স্তর-বিন্যাস বর্ণ-ব্যবস্থার ভিত্তিতেই চিরাচরিতভাবে জাতপাতের অবস্থান নির্ণয় করা হয় — ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা), বৈশ্য (বণিক, কারিগর), শূদ্র (কৃষিজীবী, সেবামূলক কাজ) এবং জাত-কাঠামো বহির্ভূত পঞ্চম বর্গ (যাদের অস্পৃশ্য বলা হয়)।

অবশ্য জাতপাত ব্যবস্থার কিছু অভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হ'ল : উত্তরাধিকার সূত্রে পেশার বিশেষীকরণ, জন্মসূত্রে মর্যাদা ও সভ্যপদ প্রাপ্তি, আচার-অনুষ্ঠানগত বিশুদ্ধতা ও কলুষতার মাত্রা; ফলতঃ সামাজিক বিযুক্তকরণ ও আন্তর্বিবাহজনিত প্রক্রিয়া। সনাতন ধারা অনুযায়ী পেশাগত বিন্যাস ও শ্রমবিভাজনের উপরই

জাতপাতের সামাজিক ক্রমোচ্চ স্তর-বিভেদ তৈরী হয়েছিল। একে যজমানী ব্যবস্থা বা পৃষ্ঠপোষক-গ্রহীতার সম্পর্কভিত্তিক ব্যবস্থা বলা হয়, যার ভিত্তিতে সকল জাতগোষ্ঠীই অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগত পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকত এবং সামাজিক স্তরগুলি নির্দিষ্ট থাকত।

২০.৩ ঔপনিবেশিক আমলে জাতপাত ব্যবস্থা

জাতপাত ব্যবস্থা সামাজিক স্তরভেদ ও শ্রম-বিভাজন নির্দেশক একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি, জাত-পঞ্চায়েতগুলি কয়েকটি স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের সীমানার মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখত। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা ছিল আচারগত নয় বরং সামাজিক ও আর্থনীতিক। দূর-দূরান্তরে কারিগরদের, শ্রমিক শ্রেণীর ও ভাগচাষীদের তৈরী পণ্যের বাণিজ্য চলত। এই সব জাতগোষ্ঠীদের তৈরী উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে ভূস্বামী ও শাসকরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের, এমনকি সাম্রাজ্যেরও ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। প্রচীন ও মধ্যযুগের সাম্রাজ্যগুলির ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যে সব প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে (যেমন — জলসেচ, জমি, উন্নয়নের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) এবং কারিগরী শিল্প ও কৃষির উৎপাদনশীলতার যে বিদ্যমান স্তর, তার সঙ্গে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতার স্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য জাতগোষ্ঠী ও জাত-পঞ্চায়েতদের ভূমিকা ছিল খুবই পরোক্ষ এবং সামান্য। তখন জাতগোষ্ঠীগুলির রাজনীতিকরণ হয়নি; অর্থনৈতিক ও পেশাগত গোষ্ঠী হিসাবে তারা কেবল পৃথক পৃথক মর্যাদাগত স্তরের ভূমিকা পালন করত। রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একরকম আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য তারা ভোগ করত। এটাও সত্য যে, স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন ভারতবর্ষে যে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছিল তার কোন চিহ্ন এই দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে ছিল না। বরং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ছিল খুবই বিকেন্দ্রীকৃত।

২০.৩.১ জাতপাত প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নীতি : বিখণ্ডায়নের স্বরূপ

ভারতবর্ষের ধর্ম ও জাতপাত সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকদের আগ্রহের অন্যতম কারণ ছিল, যে দেশ তারা শাসন করবে তার জনসাধারণের সামাজিক আচার ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবগত হওয়া। আরও বিশেষ করে তারা এটাই দেখাতে চেয়েছিল যে, ভারতবর্ষ কোন সুসংহত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক একক নয় এবং ফলত সে কখনই একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে পরিগণিত হবে না। যে পদ্ধতিতে তারা জাতপাত ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করেছে তাতে ভারতবর্ষকে একটি সংহত সমগ্র হিসেবে নির্দেশ করার বদলে তাকে বিখণ্ডিত সমাজ হিসেবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসীগোষ্ঠী ও ধর্ম ইত্যাদি সামাজিক এককগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল; অপরদিকে জাতপাতের সঙ্গে আদিবাসীগোষ্ঠীর কিংবা জাতপাত, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির যে নানাধর্মী ও নানামাত্রার পারস্পরিক যোগসূত্র সে সবই সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিগুলির মধ্যে স্ববিরোধী উপাদান লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দেখা যায়, আইন ও প্রশাসনিক বিধি রচনা করে নানারকম সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অবদমিত জাতি, আদিবাসী ও সমাজের শোষিত অংশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে তারা যে যথেষ্ট আগ্রহী সেটা প্রকাশ করছে। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে তারা পরিকল্পিতভাবে জাতপাত, আদিবাসী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাজনীতিকিরণ প্রক্রিয়াকে

জোরদার করছে এবং তার মাধ্যমে সেই সব গোষ্ঠীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পরিচয়ের বৈধকরণের দাবীকে সহায়তা করছে। যে সব সংস্থা এবং আচার-ব্যবস্থা এই নানারকম সামাজিক এককগুলিকে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল একটি সংগঠিত প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত রাখছে সেগুলি তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এটা অনস্বীকার্য যে, ঐ সব পারস্পরিকতার মধ্যেও অনৈক্যের উপাদান ছিল এমনকি শোষণের সম্পর্কও ছিল; কিন্তু সেই সব যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ পারস্পরিকতার বিষয়কে একেবারেই গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে যেভাবে জাতপাতের স্বরূপতা প্রকট হ'ল তা ছিল দেশের জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপতরীধর্মী এক প্রবণতা।

২০.৩.২ ব্রিটিশ শাসনে সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থা

ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে বাহ্যত সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে অনুন্নত জাতগোষ্ঠীগুলিকে (স্বাধীনতার পর যারা তপশীলভুক্ত জাত হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে) চিহ্নিত করার মাধ্যমে। এছাড়া তারা ১৭৬৯ সালে কলকাতায় জাত-কাছারীর (caste-cutchary) বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল যেখানে তখন পর্যন্ত শুধু ব্রাহ্মণরাই হিন্দ জাতপাত বিধির একমাত্র ব্যাখ্যাকর্তা ছিল; ১৮৫০ সালে 'জাতপাতগত অযোগ্যতা দূরীকরণ আইন' পাশ হয় (Caste Disabilities Removal Act) — অবশ্য, ঐ আইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯২৩ সালে পাশ হয়েছিল, 'বিশেষ বিবাহ বিধি' (Special Marriage Act) যার ফলে বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বৈধ বলে ঘোষিত হয়। এই সব সামাজিক বিধি-প্রণয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশদের তরফে ভারতবর্ষে একটি যুক্তিবাদী সামাজিক আইনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবু তাদের জাতপাত সংক্রান্ত সামাজিক নীতিতে যে নঞর্থক উপাদান ছিল তা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে সংঘর্ষ ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়েছে। ব্রিটিশরাই প্রথম ১৯০৯ সালে ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তীকালে তারা একইরকম পৃথক ব্যবস্থা করেছে — পাঞ্জাবে শিখদের জন্য, এবং অন্যান্য রাজ্যে ইঙ্গ-ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য। এছাড়া, প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ আম্বেদকর অবদমিত শ্রেণীগুলির জন্য এবং 'অপরিচ্ছন্ন' কাজে নিযুক্ত জাতগোষ্ঠীদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব হাজির করেন। ঐ প্রস্তাব নীতিগতভাবে গৃহীত হয় তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতার করেছিলেন, কেননা তিনি যথার্থই মনে করেছিলেন যে, ঐ প্রস্তাব কার্যকর হ'লে এখানকার জনগণের মধ্যে জাতপাতগত অযোগ্যতাকে স্থায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজের বিখণ্ডিকরণ প্রক্রিয়াও স্থায়ী হবে। গান্ধী ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমরণ অনশন শুরু করলেন এবং তার ফলে শেষপর্যন্ত ডঃ আম্বেদকরকে দিয়ে তফসিলভুক্ত জাতগোষ্ঠীদের জন্য অন্যান্য নানা ধরনের সংরক্ষণের পাশাপাশি সংসদে ও বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের অনুকূলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী প্রত্যাহার করানো গেল। কোন সন্দেহ নেই যে, জাতপাতের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হ'লে ভারতবর্ষে জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটি আরও কঠিন হয়ে পড়ত।

২০.৩.৩ জাতপাত সচেতনতা ও সংস্কৃতায়ন

অন্যদিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাদের নীতির মাধ্যমে এবং তাদের প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন এখানকার স্থানীয় ও আঞ্চলিক সচেতনাকে যেভাবে জোরদার করেছিল তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি। এই ধরণের সচেতনতা ছিল জাতীয় সংহতির দাবীর বিরোধী; ভারতবর্ষের জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার

প্রক্রিয়ার বিরোধী। 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' করার নীতির মাধ্যমেই **ঔপনিবেশিক শক্তি** ভারতবর্ষকে শাসন করেছে।

জাতপাত-ভিত্তিক আদমসুমারীর ফলে জাতগোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামাজিক মর্যাদা আদায় এবং বিভিন্ন **সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির** এক যন্ত্র হিসেবে জাত-সচেতনতা ও জাত-পরিচিতিবোধ হঠাৎ বেড়ে যায়। নিজেদের নথিভুক্ত **করার জন্য জাতগোষ্ঠী** এবং উপ-জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক ব্যাপক সক্রিয়তা শুরু হয় এবং আদমসুমারীকে তারা **উচ্চতর জাতের** মর্যাদা প্রাপ্তির এক সুযোগ হিসেবে গণ্য করে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, আদমসুমারীর মাধ্যমে উচ্চতর **জাতের মর্যাদা** প্রাপ্তির সাথে সাথেই অন্যান্য সামাজিক সুবিধাগুলি হয় আপনা আপনি আসবে কিংবা সেগুলি দাবী করা **যাবে। নিম্ন জাতের,** উচ্চতর জাতের মর্যাদা লাভের এই যে প্রক্রিয়া, যা আদমসুমারীতে দেখা গেল, তা সংস্কৃতায়ন নামে **এক বৃহত্তর প্রক্রিয়ায়** প্রকাশ পেল। আদমসুমারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতপাতের শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে শুধু যে উচ্চতর **জাতের মর্যাদা** পাওয়ার দাবি এবং প্রতি-দাবি সংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা চলছিল তা নয়, এই ধরণের দাবি সাংস্কৃতিক **কর্মকাণ্ড** ও জীবনধারার সঙ্গেও যুক্তহয়ে পড়ে। এম.এন. শ্রীনিবাস বর্ণিত এই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া নিম্নস্থ জাতগোষ্ঠীগুলির, **উচ্চতর** জাতগোষ্ঠীগুসমূহের আচারগত কর্মকাণ্ড, জীবনধারা এবং আদর্শকে গ্রহণ করে জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চতর **মর্যাদা লাভের** দাবীকেই উল্লেখ করে। ফলত এর মানে দাঁড়ায় তাদের নিজস্ব প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনধারা **বর্জনীয়,** কারণ সেগুলি নিম্নমানের। সংস্কৃতায়ন মর্যাদার গতিশীলতার মাধ্যমে নিম্নস্থ জাতগোষ্ঠীর উচ্চতার জাতের মর্যাদা লাভের আকাঙ্খাকেই প্রতিফলিত করে। নূতন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত সামাজিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকার মধ্যে এ প্রক্রিয়া তার উদ্দীপনা সংগ্রহ করে। ফলে, জাত-সনাক্তকরণ প্রচেষ্টা এক নূতন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে। ব্রিটিশ প্রশাসক - নৃতত্ত্ববিদ, জন সি. নেসফিল্ড (John C. Nesfield), ডেনিজিল (Denizil), সি. জে আইবেটসন (C. J. Ibbetson) এবং এইচ. এইচ. রিজলে (H. H. Risley) ১৮৮৫ সালে ভারতে জাতপাত-সম্পৃক্ত সামাজিক, জাতিপরিচায়ক, সাংস্কৃতিক এবং আচারগত বৈশিষ্ট্যগুলির চিহ্নিতকরণে তালিকা তৈরী করেন। এই প্রচেষ্টা ভারতের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা এবং পরবর্তীকালে আদমসুমারীর সূচনা করে। এই প্রথম জাতপাতকে এক সামাজিক অস্তিত্ব হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ধর্মীয় দল এবং আদিবাসীদের ব্যাপারেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একই কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করে।

অনুশীলনী ১

১) **'জাত বলতে কী বোঝায় ? দু' লাইনে ব্যাখ্যা করুন।**

....

....

২) **আন্তঃবিবাহ মানে জাতের ভিতরেই বিবাহ।**

হাঁ ☐ না ☐

৩) **যজমানি জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জিনিষপত্র ও সেবার পারস্পরিক আদানপ্রদান ব্যবস্থা।**

হাঁ ☐ না ☐

৪) গান্ধীজী কেন অবদমিত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পরামর্শ বাতিল করেছিলেন ? দু'লাইনে উত্তর লিখুন।

....

....

২০.৪ স্বাধীন ভারতে জাতপাত

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে অনুসৃত নীতি জাতগোষ্ঠীগুলির রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া দ্রুততর ও আত্মসচেতনতা প্রখর করে তুলেছিল। জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের নীতিগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এই নীতিগুলি গণপরিষদে উত্থাপিত হয় এবং ভারতীয় সংবিধানে তা গৃহীত হয়। ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তির শুধু নাগরিক মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে সমাজের বঞ্চিত ও অবদমিত অংশের যেমন অবদমিত জাতগোষ্ঠী, আদিবাসী ও সম্প্রদায়কে নাগরিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেছে। তপশিলী জাতগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণধর্মী বৈষম্য সাম্যভিত্তিক সমাজপ্রতিষ্ঠায় আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতি পালনের অন্যতম ব্যবস্থা। আমাদের সমাজের একটি অংশ যা বহুকাল ধরে শোষিত হচ্ছিল তাদের দ্রুত উন্নয়ন এবং সামাজিক সচলতা জাতীয় ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ় করেছে। জাতি গঠনের পক্ষে সহায়ক আত্মিক ঐক্য ছাড়াও এর ফলে সুষম সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত হয়েছে।

২০.৪.১ জাতপাত ও নির্বাচনী রাজনীতি

জাতগোষ্ঠী, যা এতদিন সামাজিক, দাতব্য এবং শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে কাজ করত, নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করল। জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরী হওয়া শুরু হ'ল। জাতগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতা জাতপাত গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ধরনের সমঝোতা আনল। এভাবে জাতপাতের কাঠামোর মধ্যে সংশ্লেষ ও বিভাজনের সৃষ্টি হ'ল।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ফলে ক্ষমতা ও সম্পদ লাভের জন্য জাতগোষ্ঠীগুলি নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। এটি তিনটি স্তরে তাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল।

১) এর ফলে এক দিকে জাতপাতের একাত্মতা বৃদ্ধি পায়, অন্য দিকে জাতি-সংঘর্ষও বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ মহারাষ্ট্রে মাহার ও মারাঠা সংঘর্ষ, অন্ধ্রপ্রদেশে কাম্মা এবং রেড্ডিদের শত্রুতা, কর্নাটকে লিঙ্গায়েত-ভোক্কালিগা সংঘর্ষ, বিহারে রাজপুত-ভূমিহারদের সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে, অধিকাংশ সংঘর্ষই ব্রাহ্মণ-বিরোধীতাযুক্ত।

২) এই জাতপাতের মধ্যে সংঘর্ষ, তীক্ষ্ণ জাত-সচেতনতা অচিরেই জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির দাবীতে জাত-সমঝোতা সৃষ্টি করল, ফলত জাতপাতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংশ্লেষণ শুরু হ'ল। এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ পাবার প্রত্যাশায় রাজনৈতিক ভিত্তির প্রসার করা। এভাবে সংশ্লেষণের মাধ্যমে বহু জাতগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটল। যেমন — গুজরাটে ক্ষত্রিয় মহাসভা, তামিলনাড়ুতে ভানিয়ার কুল সংঘর্ষ, উত্তর প্রদেশে আহীর, জাঠ, গুর্জর, রাজপুতদের (অজগর) সংগঠন উল্লেখযোগ্য। এভাবে 'কৃষক' জাতগোষ্ঠীকে নির্বাচনী রাজনীতির স্বার্থে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালান হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে জাতপাতভিত্তিক বেশ কিছু রাজনৈতিক দল তৈরী হ'ল।

৩) জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছুদিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলার পরে তা তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ বিভাজনের প্রক্রিয়ার স্তরে উপনীত হয়। জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই বিভাজন প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দের ফলে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার ফলশ্রুতি যা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতপাতগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বন্টনের ফলে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায়।

যেহেতু সংশ্লেষিত জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সব জাতপাতই সমান সংখ্যায় থাকে না অথবা সমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিলাভ করে না, সেহেতু যারা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে তারা অন্যদের পিছনে ফেলে সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের অধিকাংশ ভোগ করে। ফলে নৈরাশ্য ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ফাটল ধরে এবং ভাঙনের সূচনা হয়।

২০.৪.২ জাতপাতের রাজনীতিকরণের ফলাফল

রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতগোষ্ঠীর সংশ্লেষণ ও বিভাজনের গতিধারা আলোচনা করা হ'ল। দেখা যায় যে, জাতপাতের জাতগোষ্ঠীতে পরিবর্তনের প্রতিটি পদক্ষেপ আচারনির্ভর জাত-চেতনা ও জাত-আনুগত্যকে দুর্বল করে, কারণ তা ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতার উন্মেষ ঘটায়। চিরায়ত জাত-আদর্শ ও অস্বস্তিকর মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে পরোক্ষভাবে হ'লেও, তা নাগরিক চেতনা তীক্ষ্ণ হ'তে সহায়তা করেন।

স্বার্থান্বেষী বা প্রতিবাদী গোষ্ঠী হিসাবে জাতপাত

জাতপাতগোষ্ঠীর এবং জাতপাতের সংশ্লেষণ ও বিভাজনের যে ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় তা জাতপাতের স্বার্থান্বেষী বা প্রতিবাদী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হওয়াই নির্দেশ করে। পৃথিবীর অধিকাংশ আধুনিক সমাজে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির, মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির, একটি স্থান আছে। জাতপাতভিত্তিক একটি সংগঠন এবং ঐ ধরনের কোন সংস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা তার সভ্যপদ লাভের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে জাতপাতের সংশ্লেষণের জন্য যে প্রচেষ্টা তা জন্মসূত্রে সভ্যপদ লাভের রীতিতে এক নূতন মাত্রা নিয়ে আসে, যা জাতপাতের অর্থকে আরো বিস্তৃত করে এবং তার সনাতন আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যকে দুর্বল করে। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐ সমস্ত জাতপাতভিত্তিক সংগঠনগুলির পাঁচমিশেলী গঠন-চরিত্রের মধ্যে। জন্ম ও জ্ঞাতিবাদ — এই দুই নীতির থেকে সরে এসে স্পষ্টভাবে জোর দেওয়া হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার ওপর, যার ফলে বিভেদী জাতগুলি সংশ্লেষিত হয়।

যদি জাতপাতের সংগঠনগুলি শুধু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে এবং যদি ন্যায়সঙ্গত, নাগরিক পদ্ধতি ও পথে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, এবং আর্থ-সামাজিক দাবি-দাওয়াকে মুখর করে, তাহলে ঐ সংগঠনগুলি জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয় না। ভারতে জাতীয় সংহতির পথে যা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হ'ল জাতপাতের অবিবেচক ও সঙ্কীর্ণ প্রকাশ, যা স্বাভাবিকভাবে জাতপাতের সংগঠনগুলির মধ্যে জাত-পরিচয়ের একাত্মভূতি ঘটায়নি।

ভারতে জাতপাতের আন্দোলন

আমরা আগেই আলোচনা করেছি কিভাবে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে জাতপাত-সচেতনতা বাড়িয়ে দেয় এবং এও আলোচনা করেছি কিভাবে স্বাধীনতার আগে তপশিলী জাতের জন্য স্বতন্ত্র ভোটাধিকারের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের দূরদর্শিতার জন্য দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি রদ করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও জাতপাতের রাজনীতিকরণ থামানো যায়নি, এবং পরবর্তীকালে তপশিলী জাত ও অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়।

তপশিলী জাত এবং অংগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলন

তপশিলী জাতের আন্দোলনের মধ্যে প্রতিবাদী ও সংস্কারমূলক উভয় আন্দোলনেরই চরিত্র ছিল। সংস্কার সাধনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বে, যখন অবদমিত জাতগুলি তাদের তথাকথিত অশুদ্ধ জীবনযাত্রা বর্জন এবং 'দ্বিজ' জাতের বিশ্বাস ও জীবনধারা গ্রহণের প্রচেষ্টার সাহায্যে 'সংস্কৃতায়ন' পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, উচ্চতর জাতের মর্যাদা লাভ। তামিলনাডুর নাদাররা নিজেদের জন্য ক্ষত্রিয় জাতের মর্যাদা দাবি করে এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 'নাদার মহাজন সংযম' নামে নিজেদের জাতগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে। উত্তরপ্রদেশের চামাররা এবং নুনিয়ারা একইভাবে চৌহান ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা দাবি করে। স্বাধীনতার আগে এবং পরে সংস্কৃতায়নের অনুরূপ অনেক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও তখন অনেক আন্দোলন সংগঠিত হয় যার মধ্যে ছিল জাতবিরোধী একটা প্রবণতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণ ও জাতপাতের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব। মহারাষ্ট্রে জোতিবা ফুলের আন্দোলন তার এক নিদর্শন। মহারাষ্ট্রের 'সত্যশোধক সমাজ', তামিলনাড়ুর 'আত্মসম্মান' আন্দোলন এবং কর্ণাটকের 'বীরশৈব আন্দোলন' — এ সবই ছিল জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ডঃ আম্বেদকর মহারাষ্ট্রের এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তের তপশিলী জাতগুলিকে নেতৃত্ব দেন এবং তাদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে জাতপাত ব্যবস্থার অসুস্থ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানান। এই আন্দোলন মহারাষ্ট্রে, যেখানে মাহাররা এক বিরাট সংখ্যায় বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হন, সেখানে এক বিরাট সাফল্য লাভ করে। এই আন্দোলন স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের অনেক রাজ্যে বিস্তৃত হয়। এই ধরণের আন্দোলনগুলি প্রতিবাদের আদর্শের ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত ছিল।

তপশিলী জাতের আন্দোলন এছাড়াও এক আদর্শবাদী রূপ নেয়। বর্ণ-ব্যবস্থার ঐশী ব্যাখ্যা বর্জন করে, ক্ষমতার চিরস্থায়ীকরণের উদ্দেশ্যে শ্রেণীপ্রভুত্বের এক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দিয়ে তপশিলী জাতের আন্দোলন এক আদর্শবাদী আকার ধারণ করে। তারা ইতিহাস এবং পুরাণ থেকে প্রমাণস্বরূপ উদাহরণ দিয়ে তাদের যুক্তিগুলিকে আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে।

অনগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলনসমূহ

স্বাধীনতার আগে অনগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলনের ভিত্তিভূমি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মহীশূরের লিঙ্গায়েত শিক্ষা তহবিল সংঘ ও ভোক্কালিগা সংঘ, উত্তরপ্রদেশের যাদব ও কুর্মি মহাসভা এবং মহারাষ্ট্রের মারাঠা আন্দোলন — এর কয়েকটি উদাহরণ। ঔপনিবেশিক রাজত্বের অবসানে অনুরূপ আরো কিছু আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এগুলো ছিল একই সঙ্গে সংস্কার ও প্রতিবাদী আন্দোলন। স্বাধীনতার পরে সংরক্ষণধর্মী বৈষম্যের জন্য তপশিলী জাত ও আদিবাসী ছাড়াও অনগ্রসর শ্রেণীকেও একটা স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু, জাত, উপার্জন কিংবা শিক্ষা - কিসের ভিত্তিতে সনাক্তকরণ নীতি তা এখনো অস্বচ্ছই রয়ে গেল। এর জন্য দায়িত্ব প্রধানত ভারতরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির ওপর চলে আসে। অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য পদের সংরক্ষণ, চাকরি, শিক্ষা এবং সম্পদের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার - এ সব ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে। যদিও অধিকাংশ রাজ্য তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, তবু বিষয়টি এখনো বিতর্কিতই রয়ে গেছে।

২০.৫ আধুনিকীকরণ, জাতীয় সংহতি এবং জাতপাত

আধুনিকীকরণ, সমাজের পরিকাঠামোয় ও ভাবাদর্শে নতুনতর গতির সঞ্চার করে। এর বৃদ্ধি জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়াকে জোরালো করে। ভারতবর্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া বর্তমানে অনেকটাই বিকশিত হয়ে উঠেছে। সংবিধান, গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী রাজনীতি, অসাম্য ও শোষণ দূরীকরণের উদ্দেশ্য প্রণীত আর্থ-সামাজিক সংস্কার আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে সবল করেছে। যোজনার মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি, সমাজ-সংস্কার, ন্যায়-বিচার বন্টন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা জাতগোষ্ঠীর সামাজিক পরিকাঠামো, মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হয় যে, প্রতিবাদী ও সংস্কারমূলক সংগঠন হিসেবে এই জাতগোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব জাতিভেদ প্রথাকে আরো সরল করে তুলবে। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ পূর্বাভাস দেন যে, ভারতবর্ষে জাতপাত প্রথা উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠবে। কিন্তু অচিরেই লক্ষ্য করা যায় যে, জাতগোষ্ঠীগুলি কেবল আধুনিকীকরণের সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক চাহিদার অভিযোজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলিকেই স্পষ্ট করে তুলছে। তারা জাতপাত বা জাতপাত প্রথা-কেন্দ্রিক নয়, তাদের উদ্দেশ্য জাত-পরিচয়ের ভিত্তিতে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় জনগণকে সংগঠিত করা, যেহেতু কোনও বিকল্প পরিচিতি নেই বা তখনও প্রকাশ পায়নি। বিভিন্ন জাতপাতের সংশ্লেষ ও বিভাজনে এই ব্যাপারটি বিশদভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, আত্মীয়গোষ্ঠী বা অবর-জাতের নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোগত পরিসীমাকে লঙ্ঘন করে, জাতপাত আলম্বিক ও আনুভূমিক প্রান্তে উত্তরণ ও বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে।

জীবিকাগত সচলতা যত গতিশীল হয়, দেশের শিক্ষা, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রচলন তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। চাপ বাড়তে থাকে জাত-পরিচয়ে। আর্থিক মজুরির ব্যাপক প্রচলন ও গ্রামাঞ্চলে বাজারভিত্তিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলে যজমানির অর্থনৈতিক ভূমিকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। জীবিকার বংশভিত্তিক বিশেষীকরণের গুরুত্ব অর্থনীতিতে ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। ব্যাপক নগরমুখী অভিবাসনের ফলে জাতপাতভিত্তিক পারস্পরিক আর্থিক ও সামাজিক আদানপ্রদানের বন্ধন ভেঙে যেতে থাকে। জমিদারিপ্রথার বিলোপ ও পঞ্চায়েত রাজের প্রচলন নিম্নবর্গের উপর উচ্চজাত উচ্চশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ও শোষণকে ব্যাহত করেছে। এইভাবে ভারতবর্ষে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জাতপাত প্রথার সামাজিক, কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে, বর্তমানকালে বংশ পরম্পরাভিত্তিক জীবিকাগুলি আর অলঙ্ঘনীয় নয়; যজমানি সম্পর্ক দেশে বেশীর ভাগ অঞ্চলেই প্রায় বিলুপ্ত। যানবাহনের নতুন মাধ্যমের আবির্ভাব, নগরায়নের ও শিল্পায়নের বৃদ্ধি, সমাজের পারস্পরিক আদানপ্রদানের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে, বিশেষত 'অস্পৃশ্যতা'কে দুর্বল করে দিয়েছে। বর্তমানে এগুলির আচরণ ও সমর্থন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা দেখি যে, সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, বহু স্বয়ংসেবী সংস্থাগুলি জাত-পরিচয়কে নির্ণায়ক হিসেবে ধরে না। সামাজিক উদ্দেশ্য, জীবিকাগত স্বার্থ ও জনহিতকর কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠিত হয় এই স্বয়ংসেবী সংস্থাগুলি। তাই, জাতপাত প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে, নয়তো এই প্রথার চিরায়ত অস্তিত্বের কিছু অভিযোজনীয় পরিবর্তন আসবে। এই প্রক্রিয়াসমূহ ক্রমাগতভাবে জাতীয় সংহতি সাধনের শক্তিকে দৃঢ়তর করে তুলবে।

অনুশীলনী ২

১) সংরক্ষণধর্মী বলতে কী বোঝায় ? পাঁচ লাইনে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

২) জাতপাতগোষ্ঠী কীভাবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে ব্যাখ্যা করুন। দু'লাইনে উত্তর দিন।

....

....

৩) আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ভারতে জাতপাত প্রথাকে দুর্বল করেছে।

হাঁ ☐ না ☐

৪) স্বাধীনোত্তর কালে কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি জাতপাত প্রথাকে প্রভাবিত করেছে ? চার লাইনে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

....

২০.৬ আদিবাসী সংস্কৃতি : বিবিধ রীতি ও সমস্যা

ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতিসমূহকে ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম মাত্রা হিসেবে ধরা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকেই কিছু আদিবাসীগোষ্ঠী উন্নতমানের সভ্যতার সান্নিধ্যে আসে। এই তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে যখন 'জাতির' বিপরীত হিসেবে এই গোষ্ঠীগুলিকে 'জন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই মানবগোষ্ঠীর দৈহিক আদল ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, তারা বিচিত্র দেবতার আরাধনা করত ও বনেজঙ্গলে-পাহাড়ে বাস করত।

২০.৬.১ ভারতবর্ষে আদিবাসী জনসংখ্যা

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ আদিবাসী মানবগোষ্ঠী। দেশের চারটি অঞ্চলে আদিবাসী জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে, যথা-অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও মেঘালয়ে এই আদিবাসীগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশ্য, বেশীরভাগ আদিবাসীগোষ্ঠী, গুজরাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের

মধ্যবলয়ে বসবাস করে। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মত রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশী। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থানে এই জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে। অবশ্য ভারতের সম্পূর্ণ মধ্যাঞ্চলে আদিবাসীগোষ্ঠী মাত্র ১৩টি জেলাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর কেন্দ্রীভবনের তৃতীয় অঞ্চলটি কাশ্মীর থেকে সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত 'সিসহিমালয় (Cis Himalaya) অঞ্চল'। কেন্দ্রীভবনের চতুর্থ অঞ্চলটি সুদূর দক্ষিণে, কিন্তু সেখানে আদিবাসী জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। দৈহিক আকারে পৃথক এই প্রকার প্রায় ৪৫০টি স্বতন্ত্র আদিবাসীগোষ্ঠী ভারতে বাস করে। এদের জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ২৪ জন। জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম আদিবাসীগোষ্ঠীর জীবনযাপনের দ্বারা নির্ণয় করে। এদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বিচিত্র, তবে তা মূলত শিকার করা ও খাদ্য-সংগ্রহ করা। কারিগরগোষ্ঠীসমূহ বিভিন্ন কলাশিল্প কাজে নিয়োজিত এবং কিছু শিল্পশ্রমিকের কাজে নিযুক্ত। যদিও আদমসুমারী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, অধিকাংশ আদিবাসীগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মাবলম্বী তবুও বেশ কিছু সংখ্যক আদিবাসীগোষ্ঠী খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কয়েকটি গোষ্ঠী এখনো তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসকেই মেনে চলেছে। স্থায়ী কৃষিকাজে অনুপযুক্ত অঞ্চলেই যে আদিবাসী জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত এই ধরণের চিন্তাধারা ভ্রান্ত, কারণ ভারতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মালভূমি ও সমতলভূমিভিত্তিক স্থায়ী কৃষিকাজকে জীবিকানির্বাহের পন্থা করে নিয়েছে। যদিও কিছু আদিবাসীগোষ্ঠী এমন অঞ্চলে বসবাস করে যেখানে অসমতল ভূমি হওয়ার দরুন সাধারণ কৃষিকাজ সম্ভব নয়।

২০.৬.২ আদিবাসীগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য

গাঙ্গেয় সমভূমিতে বসবাসকারী আদিবাসী বা সেই লোকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে তারা যাদের গায়ের রং কালো, মুখ গোল, নাক চাপা এবং কপাল নীচু। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা 'মঙ্গোলীয়' দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। গুজরাত ও কেরলে ওই প্রবণতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। সুতরাং অধিকাংশ আদিবসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের অঞ্চলের সাধারণ জনগণের থেকে শারীরিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত আত্তীকরণও এই সত্যকে মুছে ফেলতে পারে না যে, একজন নাগার এবং একজন অসমীয় হিন্দুর মধ্যে চেহারায় প্রচুর পার্থক্য আছে এবং একজন কাদের, কোচিনের সাধারণ হিন্দুর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রবল জাতিগত বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে জাতকে ভিত্তি করে কোনও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। এই সার্বিক ঐক্যের অন্যতম কারণ হিন্দু জাতভিত্তিক সমাজের ভাবাদর্শে অন্তর্নিহিত; যে ভাবাদর্শ এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, মনুষ্য জাত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আন্তঃবিবাহরীতি ও সামাজিক অন্তর্মুখীতা যেহেতু অন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেহেতু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সামাজিক দূরত্ব স্থাপনের প্রয়োজন হয় না।

২০.৬.৩ আদিবাসী ভাষাসমূহ

ভারতে আদিবাসী জনগণ যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করে থাকে সেগুলিকে ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড়-বিভাজনের মধ্যে ফেলা যায়। ইন্দো-আর্য ভাষার মধ্যে কয়েকটি ভাষা আদিবাসী সম্পর্কিত বলে নির্ধারিত হয়েছে, যেমন — ভিলি। ভাষা কিন্তু কোন অপরিবর্তনীয় উপাদান নয়। একটি আদিবাসী সম্প্রদায় নিজের লোকগোষ্ঠীগত আত্মপরিচিতের পরিবর্তন না করেও প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হ'ল দ্বি-ভাষাতত্ত্ব। কখনও এটি পরিবর্তনশীল স্তর হিসেবে কাজ করে এবং ক্রমশ আদিবাসী ভাষার অবক্ষয় ও বিলুপ্তি ঘটে। এই প্রক্রিয়া শত শত বছর

ধরে ঘটে চলেছে। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ই, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি, তাদের আদি ভাষা হারিয়ে ফেলেছে এবং বর্তমানে তারা ভারতের প্রধান ভাষাগুলির একটিতে কথা বলে। মধ্য ভারতের গোণ্ড সম্প্রদায় নিজ ভাষা জানেও না, তারা যে অঞ্চলে বসাবাস করে তার ভিত্তিতে হিন্দী, মারাঠি ও তেলেগু ওড়িয়া ভাষায় উচ্চারিত হয়। যখন একটি আদিবাসী সম্প্রদায় ভাষাগত আত্তীকরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সেই সম্প্রদায় বিবিধ এবং বিচিত্র ব্যবহারিক আদর্শকেও গ্রহণ করে নেয়।

২০.৬.৪ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ও আদিবাসী

প্রকৃতি আদিবাসী জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়ার ওপর নির্ভর করে আদিবাসী অর্থনীতির কয়েকটি ধারা বিবর্তিত হয়েছে। বহুকাল ধরেই আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে পেয়েছে স্বস্তিদায়ক বাসস্থান এবং সেখানে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের এক পরিমিত মান বজায় রেখেছে। কিন্তু অনেক বনাঞ্চলে বিভিন্ন কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে; অতিরিক্ত হারে লাভ ও প্রমোদ উদ্দেশ্যে পশু শিকার হওয়ার দরুন বন্যজীবন বিনষ্ট হয়ে গেছে। বনসম্পদের অবক্ষয় ও প্রাকৃতিক বর্ধন-প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক বিকল্পের প্রচলন হওয়া উদ্ভিদ জীবনের পরিবর্তন এসেছে।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার হ্রাস পাওয়ায়, যেমন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবহারে বাধা আসা, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত না হওয়ার ফলে আদিবাসীদের বিস্বাদ ও অখাদ্য শিকড় ও কন্দ খেয়ে জীবনধারণ করতে হচ্ছে অথবা বেশ কিছু কালের জন্য অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। অনেক অঞ্চলেই বাসস্থান নির্মানের উপাদানও দুর্লভ। সুতরাং তারা খাদ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই আদিবাসীগোষ্ঠীর সাক্ষরতার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে এবং এদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া প্রায় স্থগিত। প্রগতিশীল আদিবাসী ও অনাদিবাসীরা এই জনগোষ্ঠীর উপর সার্বিক চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু বিশেষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে এক অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্তারের অভুজমান, উড়িষ্যার বন্দো পরোজা, আন্দামানের ওঙ্গে ও জারোয়াগোষ্ঠীর উল্লেখ করা যায়।

২০.৬.৫ আদিবাসী কৃষকদের সমস্যা

ভারতে আদিবাসীদের ইতিহাস এই গোষ্ঠীর কৃষক হয়ে ওঠার ইতিহাস। সরকারি নীতি হ'ল ঝুম চাষের বিস্তার হ্রাস করা, ধানচাষ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা, আদিবাসী অঞ্চলে নতুন কৃষি-কৌশল প্রয়োগ করা ও কৃষিখাতে পুঁজি বিনিয়োগ বর্ধিত করা। এই অঞ্চলগুলিতে সরকারি এজেন্সীর দ্বারা উন্নত কৃষিপ্রযুক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। এমন অভিনব কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যা খরাপ্রবণ এলাকা ও পার্বত্যঞ্চলে ফলদায়ক হবে। বর্তমানে স্থায়ী কৃষিকাজের অধিকাংশই জীবিকানির্বাহের স্তরেই সীমিত এবং আদিবাসীদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকাংশই বাজারে বিক্রীর সুযোগ হয় না। অনেক সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করবার জন্য তারা শস্য আপৎকালীন বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অবশ্য আধুনিক কৃষিকাজ প্রচলিত হয়েছে ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও ওঁরাও, মধ্যভারতের গোণ্ড ও কর্কু এবং নীলগিরি অঞ্চলের বদগা ও মুল্লু করম্বা আদিবাসীদের মধ্যে। নারকেলাদি পণ্যশস্য নিকোবারিদের এবং বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ে পরিণত করেছে। পণ্যশস্য চাষের প্রয়োগের খবর পাওয়া গেছে গুজরাত, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের

আদিবাসী সমাজে।

কৃষক অর্থনীতির ধ্রুপদী বিবরণের সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে ভারতের আদিবাসী সমাজের বৃহদাংশে। এই অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা সামান্য প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের প্রয়োগ করে থাকে এবং জীবিকানির্বাহের জন্য মূলত নিজেদেরই উৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভর করে থাকে।

ভূমি-ক্ষুধা, ভূমি-বিচ্ছিন্নতা এবং ভূমিহীনতা

আদিবাসী কেন্দ্রীভবনের মধ্যাঞ্চলে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় মূল হ'ল কৃষি সংক্রান্ত বিষয়। পশ্চিমাঞ্চলে ভূমির অভাব ও ভূমি-ক্ষুধা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ বলশালী রাজপুত, মারাঠা ও অন্যান্য হিন্দু কৃষক সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের বহিষ্কার। ভূমি-ক্ষুধার অন্যতম সহযোগী কারণগুলি হ'ল ভূমির কম উৎপাদনশীলতা, আদিম পদ্ধতিতে চাষ; আদিবাসী স্বার্থ রক্ষণার্থে কোন আইনি ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য জাতের দ্বারা আদিবাসীদের ক্রমাগত শোষণ এবং আদিবাসী অর্থনীতির অ-বিভিন্নতা।

মধ্যভারতের সব অঞ্চলেই, আধিবাসীদের হাত থেকে অ-আদিবাসীদের মধ্যে ভূমি-বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় আইনি ব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ফলে। এই ত্রুটিগুলি পরে আবিষ্কৃত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ধেবর কমিশন অনেকগুলি সুপারিশ করে। আদিবাসী অঞ্চলে কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের কাছে কোন পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত নেই এবং খরাপ্রবণ এলাকায় বর্ষা না হ'লে অপরিমিত দুর্দশার সৃষ্টি হয়। অনেক অঞ্চলেই সংকটাকীর্ণ অবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

ঋণগ্রস্ততা এবং দাস-মজুর (Bonded labour)

প্রায় সমগ্র আদিবাসী অধুষ্যিত অঞ্চলে, নগদ-ধারে সাবেকি প্রথা, শোষণের চরমতম রূপের একটি। আদিবাসী মানুষ এখনও এই প্রথার কবলে রয়েছে। ঋণগ্রস্ততার অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য হ'ল দাসমজুরি। অনেক স্থানেই এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। আইনি প্রতিকার দ্বারা দাস-মজুর প্রথার বিলোপের প্রচেষ্টা চালানে হয়েছিল, কিন্তু এই সত্য উপলব্ধ হয়নি যে, সনাক্তকরণ ও পুনর্বাসন দাসত্ব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পুনর্বাসন প্রকল্প তখনই সফল হবে, যখন এই প্রচেষ্টার যথেষ্ট গতিবৃদ্ধি হবে।

অনুশীলনী ৩

১) আদিবাসীরা প্রধানত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উৎপাদন করে।

হাঁ ☐ না ☐

২) পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আদিবাসীদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে।

হাঁ ☐ না ☐

৩) 'মঙ্গোলয়েড' শব্দটি সম্পর্কিত (সঠিক উত্তরে ✓ দাগ দিন)

(ক) আদিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। ( )

(খ) আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে। ( )

(গ) আদিবাসীদের অর্থনীতির সঙ্গে ( )

৩) আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের মধ্যে পরস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে আদিবাসীরা অধিক পরিমাণে ভূমি ও অন্যান প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার পেয়েছে।

হাঁ ☐ না ☐

৫) আদিবাসী কৃষকদের প্রধান সমস্যাগুলি উল্লেখ করুন। তিন লাইনে উত্তর দিন।

....

....

....

২০.৭ নগর পরিমণ্ডলে আদিবাসী

ভারতে আদিবাসীদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই শহরে বাস করে। একথা সত্য যে, বহুকাল যাবৎ এই আদিবসীরা নগর সভ্যতা থেকে বেশ দূরেই অবস্থান করত। তবে বর্তমানে বিশেষত কিছু সংখ্যক আদিবাসী প্রশাসনিক সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যাপক শিল্পায়নের জন্য শহরে এসে বসবাস করছে।

২০.৭.১ শিল্পায়ন ও আদিবাসীত্ব হনন

যেখানে নগরায়ন অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে এবং শহুরে মূল্যবোধ গ্রহণ করতে মানুষের কিছু সময় লাগে সেখানে শিল্পায়নের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। শহুরে ব্যবস্থায় এই অভিবাসিত আদিবাসীরা সচেষ্ট হয় এক স্থানে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে। যদিও বেশ কিছু সময়ের পরে এটা সম্ভব হয় না এবং এই মানুষগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর দেশে যখন ব্যাপক শিল্পায়ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তখন দেখা যায় যে, ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার কিছু অঞ্চল অত্যন্ত উপযুক্ত। কারণ ঐ স্থানে লোহা ও কয়লা দুই-ই পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলগুলির আদিবাসী অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। এমনকি স্বাধীনতার আগেও ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকায় বহুল পরিমাণে আদিবাসী পরিলক্ষিত হয়। এভাবে দেখা যায়, জামশেদপুরের ইস্পাতনগরী 'হো' নামের আদিবাসীদের বাসভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত। গুয়া এবং নোয়ামুণ্ডীর কয়লা ও লৌহখনি, মোসাবনীর তাম্রখনি এবং লোহারডাগার বক্সাইট খনি এসবই ঐ একই অঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই শিল্পায়ন কেবল আদিবাসী সমাজের শিল্পে কর্মরত ব্যক্তিদেরই রূপান্তরিত করেনি তাদের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যক্তিদেরও করেছে।

২০.৭.২ মুদ্রা প্রচলন ও শিক্ষার প্রসার

মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলিত হবার পর থেকেই শহরবাসী আদিবাসী মানুষদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেল। তারা সনাতন গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বদলে ব্যক্তিগত সাফল্য ও ব্যক্তিগত জীবিকার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। এর ফলে পরিবারের কাঠামো এবং পরিবারসহ নারী-পুরুষের ভূমিকারও আমূল পরিবর্তন হ'ল। শিল্প-সমাজে বয়স্কদের প্রতি

কনিষ্ঠদের, পুরুষদের প্রতি নারীর বা সর্দারের প্রতি সাধারণের যে শ্রদ্ধা-ভক্তিএসবের স্থান খুবই সামান্য। এই নব্য শিল্প-সমাজ নেতৃত্বের ধরন ও প্রকৃতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। একজন মানুষ, যে শ্রমিক হিসেবে প্রবেশ করেছিল, পদোন্নতির ফলে পরবর্তীকালে সে যখন ফোরম্যান হয়ে যায় তখন সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে। এ ধরনের সামাজিক সচলতা আগে অজ্ঞাত ছিল। এভাবে একটি আত্মসচেতন মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীর এবং শেষ পর্যন্ত শ্রেণী ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়, যার অস্তিত্ব আগে মধ্য-ভারতের আদিবাসীগোষ্ঠীতে ছিল না এবং এটি হ'ল আদিবাসী সমাজের নিয়মনীতির বিরোধ।

শহরাঞ্চলে সহজলভ্য আধুনিক শিক্ষার সুযোগ মানুষকে কার্য-কারণ তত্ত্ব বা হেতুবাদ সম্পর্কের গুরুত্বে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই নতুন বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে তারা কুসংস্কার, ডাকিনীবিদ্যা প্রভৃতির প্রতি আর বিশ্বস্ত থাকে না। শিল্প ব্যবস্থায় মানুষ তার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। প্রকৃতপক্ষে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি সর্বদাই এই ধারণাগুলিকে জোর দেয়। কাজেই শহুরে আদিবাসী মানুষদের যথেষ্ট সুযোগ থাকে তাদের ক্ষোভের কথা জানানোর এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের দাবী করার।

২০.৭.৩ আদিবাসী মানুষদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন

সব থেকে বড় মৌলিক পরিবর্তন হ'ল সমজাতীয়তার হানি। অভিবাসী আদিবাসী শ্রমিকরা শহরের বস্তি এলাকায় অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যেই বাস করে এবং এই অবস্থায় তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অস্বচ্ছ হয়ে যেতে থাকে; আর অবশেষে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার উদ্ভব হয়। রাঁচী ও জামশেদপুরের আশেপাশে সমীক্ষা করে দেখা গেছে আদিবাসী তরুণরা বিভিন্ন দুষ্কৃতকারী দলগুলির সঙ্গে জড়িত এবং তারা সেখানে যথেষ্ট সক্রিয়। শ্রমিক বস্তির মধ্যে আপেক্ষিক পরিচয়হীনতা আদিবাসীদের মধ্যে প্রভূত সমাজ বিরোধী প্রবণতার জন্ম দেয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, সাবেক গ্রামের সর্দার প্রভৃতিদের দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শহরে অনুপস্থিত থাকে। শহর শিল্প মহলে আদিবাসীদের বাইরে গোষ্ঠী পরিচিত বিস্তৃত করার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তঃআদিবাসী বিবাহ, ট্রেডইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের আদিবাসী অস্তিত্বকে অতিক্রম করে যায়। রেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র ও সাম্প্রতিক কালে টি.ভি প্রভৃতি তাদের কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করে যা গ্রাম্য সমাজে কল্পনার অতীত ছিল। এইভাবে পৃথিবীর গণ্ডী ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা বিস্তৃত হয় এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার স্তর আরো বাড়তে থাকে।

আগে আদিবাসী মানুষরা দুর্দিনে, বেকারীত্বের সময়ে অথবা অসুস্থকালে তাদের গোষ্ঠীর লোকেদের সাহায্য চাইত। বংশ, আত্মীয়তার বন্ধন নিরাপত্তার প্রতীক ছিল। বর্তমানে তাদের দাম্পত্য জীবন আত্মীয়তর বন্ধনের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অবসরকালীন কাজকর্ম সমাজ পরিবর্তনের সূচক। এর মাধ্যমে আমরা উত্তেজনা, হতাশা, মূল্যবোধ প্রভৃতি দেখতে পাই। তাদের বেশীরভাগ কাজকর্ম শুধু যে আনন্দ পাবার জন্য তাই নয়, বরং এগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক। আদিবসী গ্রামগুলিতে তারা ধেনো মদ পান, যৌনসংসর্গ, নাচগান, উপকথা, হেয়ালি প্রভৃতি করত; প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করত; জ্ঞাতি-আত্মীয়দের সাথে নানা ধরনের গল্পগুজব করত। এধরনের কাজে নারী, পুরুষ ও শিশুর নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। শহরাঞ্চলে এর বেশীর ভাগই সিনেমা দেখা, থিয়েটার কিংবা ফুটবল খেলা দেখার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে।

এদের খাদ্যাভাসেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামে তারা ভাত, সবজী, ডাল বা কখন কখন আমিষ আহারেই সন্তুষ্ট থাকত। এখন তরা খুব বেশী পরিমাণে রুটি, শাকসবজী, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ প্রভৃতি ব্যবহার করছে। চা পান করা তাদের নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

শহরে আদিবাসী ও অন্যান্য মানুষদের মধ্যে স্বাধীনভবে মেলামেশার সুযোগ থাকে। এদের মধ্যে বেশ কিছু বিবাহের কথাও জানা গেছে। তাদের মধ্যে শহুরে ভাষা গ্রহণ করার প্রবণতাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিবাসী জীবনে ধর্মের প্রভাব কমেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, শহুরে পরিস্থিতিতে আদিবাসীদের বিষেশ বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা বৃহত্তর জনসমাজেরই একটি অংশ হিসেবে গড়ে উঠছে। তারা ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী হবার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সংমিশ্রণের আকারটি গড়ে ওঠার পথে। অবশ্য, আমরা দেখতে চাই যে, আদিবাসী মানুষরা পুরোপুরি শহুরে শিল্প ব্যবস্থার জোয়ারে ভেসে যায়নি বরং তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে।

২০.৮ ভারতে আদিবাসীদের বিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

আদিবাসী মানুষরা তাদের অনুন্নত কৃৎকৌশল সার্বিক অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচিতির ফলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার জটিল সমস্যার কারণে জতির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আদিবসী সমস্যা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল-সংরক্ষণবাদী, আত্তীকরণবাদী ও সংহতিকামী।

২০.৮.১ সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র করে রাখার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সরকার এই আদিবাসীদের অন্যান্য জনগণের থেকে আলাদ করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক ছিল। কারণ, প্রশাসনের এক্তিয়ার পাহাড় ও বনাঞ্চলে পৌঁছাত না। বহু ব্রিটিশ প্রশাসক অনুভব করতেন যে, আদিবাসীদের জীবনধারায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা দেশের অন্যান্য এলাকার জীবনধারার চেয়ে অনেক সন্তোষজনক ছিল। তবে, এটি ছিল জনগণকে জাতীয় আন্দোলনের উদ্বেল থেকে দূরে রাখার ঔপনিবেশিক নীতি।

এই স্বতন্ত্রীকরণ নীতি নৃতত্ত্ববিদদের ওপর ভ্রান্তভাবে আরোপ করা হয়েছিল। কারণ, মনে করা হ'ত, তারা তাদের গবেষণার স্বার্থে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রাচীন রূপকেই সংরক্ষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। একদা ভেরিয়ার এলউইন (Verrier Elwin) যাতে অনিয়ন্ত্রিত সংযোগের ফলে বহিরাগতদের দ্বারা আদিবাসীদের প্রবল শোষণ না ঘটে সেজন্য 'পার্কল্যান্ড তত্ত্ব' প্রয়োগ করার কথা বলেছিলেন।। অবশ্য স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তিনিই আদিবাসী অঞ্চলে গঠনমূলক হস্তক্ষেপের নীতির সব থেকে বড় সমর্থক ছিলেন।

২০.৮.২ আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ আদিবাসী এলাকায় মানবিক কাজের সঙ্গে জড়িত সমাজসেবী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি প্রস্তাব করেছিল। তারা সেবা ও আদর্শের ধ্যানধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদিও তাদের সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আদিবাসী অনুভূতিকে আহত করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস হ'ল অধ্যাপক ঘুরের (Ghurye) তত্ত্ব যেখানে তিনি বলেছেন যে, আদিবাসীরা হ'ল পশ্চাৎপদ হিন্দু যাদের কৃৎকৌশলের দিক থেকে অগ্রণী জনগণ বন ও পাহাড়

অঞ্চলে সরিয়ে দিয়েছে।

এই মতবাদের ভিন্ন প্রবক্তরা হ'লেন খ্রীস্টান মিশনারীরা, যাঁরা অনুভব করেছিলেন আদিবাসী সমস্যা দূর করার একমাত্র উপায় হ'ল তাদের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। যদি আদিবসীদের একটি নতুন বিশ্বাসে ধর্মান্তকরণের ফলে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পায় এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে না করে ও আধুনিক জীবনে ভালভাবে যোগ দিতে পারার উপযুক্ত হয় তবে এই ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু, এর ফলে যদি এটি তাদের বিকল্প সন্তুষ্টি অনুভবের বদলে বিচ্ছিন্ন ও আদিবাসী চরিত্র হনন করে, তবে এ ধরণের গূঢ় সমস্যার জন্যে এই মতবাদ কোনও আন্তরিক সমাধান নয়।

২০.৮.৩ সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী সংরক্ষণবাদী, যেখানে বলা হয়েছে যে, আদিবাসীদের বিশেষ স্বকীয়তাকে নষ্ট না করেই জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে তাদের অংশীদার করার প্রচেষ্টা করা হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি হ'ল নকশার মত যেখানে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। নৃতত্ত্ববিদরা আদিবাসীদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক ও কাম্য উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ ধরণের পরিকল্পনার জন্য তারা যথেষ্ট সতর্ক ও যত্নবান হবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সন্দেহজনক মূল্যবোধ তৈরীর ক্ষেত্রে আপত্তি করেছেন। এই সমস্যার বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদদের চিন্তাধারার একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি জাতীয় নীতিতে গৃহিত করা হয়েছে। তাঁরা আদিবাসী সংস্কৃতির গুরুত্বকে বোঝার উপর জোর দিয়েছেন; কেবল তাদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করাই নয়, তাদের জীবনের সংহতিকারী শাক্তিগুলি, যা তাদের সংস্কৃতির কাঠামোর সঙ্গে অপরিহার্য্য যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে, সেগুলি বোঝার ওপরও জোর দিয়েছেন। তাঁরা আদিবাসীদের প্রয়োজনকে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার জন্য যথেষ্ট সতর্কভাবে উন্নয়নের নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন। তাঁরা যে সমস্ত ব্যবস্থা চালু করার ফলে তাদের সামাজিক সংহতি নষ্ট হবার এবং তাদের বাঁচার আনন্দ নষ্ট হবার সম্ভাবনা সেই উপাদানগুলি নির্মূল করার জন্য সতর্ক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনের সুপারিশ করেছেন।

আদিবাসী উন্নয়নের পথপ্রদর্শিকা নীতি হিসেবে আমদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর চিন্তাধারাকে ভেরিয়ার এলউইন যথাযোগ্যভাবে 'আদিবাসী পঞ্চশীল' নামে চালু করেছিলেন। পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি হ'ল যথাক্রমে — আদিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নতি করবে; প্রভাবশালী জনগণ কোনকিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেবে না; ভূমি ও বনাঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকারকে মানতে হবে; উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব আমাদের গড়ে তোলা উচিত; ঐ অঞ্চলে কোন প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশাসন থাকবে না; তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেই কাজ চালানোর প্রচেষ্টা রাখতে হবে এবং সবশেষে এসবের ফলাফল অর্থ-ব্যয়ের পরিমাণের উপর নয় বরং কি ধরনের মানবিক চরিত্র বিকাশের মাধ্যমে হ'ল তার উপর নির্ভর করবে।

ভারতের আদিবাসী গঠনমূলক চিন্তা ও পরিকল্পিত সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি আনার ভাল সুযোগ এনে দিয়েছে। বর্তমানে একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, আদিবাসী সমস্যা কেবল গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সমস্যার আরেকটি সংযোজন নয়। যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি একে অপরের থেকে পৃথক নয় বরং সহযোগী। আমরা অবশ্যই আদিবাসীরা তাদের যে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে সেরা মনে করে সেগুলিকে সংরক্ষণ করব, এবং তারাও অন্যান্য জনগণের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গ্রহণ এবং স্বীকরণ

করবে, আর এভাবে তাদের সঙ্গে শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, মানসিক ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ হবে। যতদিন না এই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে, ততদিন ভারতে জাতি গঠনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

অনুশীলনী ৪

১) আদিবাসিত্ব হনন কাকে বলে ? দু'লাইনে উত্তর দিন।

....

....

২) শহুরে ব্যবস্থায় আদিবাসীদের সমজাতীয়তা বর্তমান থাকে।

হাঁ ☐ না ☐

৩) জাতীয় জীবনে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার জন্য তিনটি মতবাদের নাম কী ?

....

....

....

৪) ব্রিটিশরা আদিবাসী উন্নয়নের জন্য সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল।

হাঁ ☐ না ☐

৫) 'আদিবাসী পঞ্চশীলের' পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কী কী।

....

....

....

....

....

....

২০.৯ সারাংশ

ব্যবস্থা হিসেবে জাতপাত বৈষম্যবাদী। এই অসাম্যের সৃষ্টি কেবল সমাজের বিধিগত গঠন থেকেই নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও। জাতপাত এবং প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

ব্রিটিশরা জাতপাত ব্যবস্থাকে জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তাদের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি

একদিকে সাংস্কৃতায়নের গতিকে সুদৃঢ় করেছিল, অন্যদিকে জাতপাত সম্বন্ধে সচেতনতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

স্বাধীনোত্তরকালে নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ (বিভিন্ন জাতের সংশ্লেষ ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তি প্রসার) জাতপাতের আচারগত দিকটিকে দুর্বল করেছে।

প্রগতির ধারার উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় যে, জাতপাত ব্যবস্থা তার চিরায়ত অস্তিত্বের থেকে অভাবনীয়ভাবে পরিবর্তিত হবে।

ভাষা এবং অর্থনীতির দিক থেকে ভারতের আদিবাসীরা ভিন্নতর গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সাম্প্রতিকালে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার জন্য আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও, আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে জমি থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, ভূমিহীনতা, ঋণগ্রস্ততার সমস্যা রয়েছে। শিল্পায়ন, শিক্ষা, মুদ্রা প্রচলন ও নগরায়ন শহরবাসী আদিবাসীদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুততর করেছে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানুষের আদানপ্রদানে আদিবাসীরা বিশেষ লাভবান হয়নি। ভারতের আদিবাসীদের বিভিন্নতা বিবেচনা করলে একথা খুবই আশ্চর্য্যজনক মনে হয় যে, জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য তারা সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। এটা তাদের প্রয়োজনানুসারে উন্নতির কথাই বলে।

২০.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

জাতপাত : উচ্চনীচ, পবিত্র-অপবিত্র এবং বংশানুক্রমিক জীবিকার ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত আন্তঃবিবাহমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

জাত-দ্বন্দ্ব : অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করে জাতপাত-গোষ্ঠীর অর্ন্তদ্বন্দ্ব।

যজমানি : বিভিন্ন জাতপাত-গোষ্ঠীর মধ্যে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের ভিত্তিতে বস্তু ও সেবার পারস্পরিক আদান-প্রদান ব্যবস্থা।

জাতীয় ঐক্য : বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যমূলক স্বীকরণ পদ্ধতি।

সংস্কৃতায়ন : ব্রাত্য জীবনধারা পরিত্যাগের পদ্ধতি ও নিম্নশ্রেণীর জাতের দ্বারা উচ্চতর জাতের মর্যাদা অর্জনের জন্য উচ্চতর জাতের জীবন-ধারা ও বিশ্বাস গ্রহণের প্রচেষ্টা।

ঝুম-চাষ : পাহাড়ী এলাকায় শস্য উৎপাদনের এক পদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় শীতকালে পাহাড়ের গায়ের ঝোপ-জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাই জমিতে ছড়িয়ে পড়ে সারের কাজ করে। একস্থানে এক বা দুই ঋতু চাষের পর আবার অন্যস্থানে একই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়।

পণ্য-শস্য : কেবলমাত্র বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের জন্য উৎপাদিত শস্য।

আদিবাসীত্বহনন : আদিবাসী মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রথা এবং জীবন-ধারা ত্যাগের পদ্ধতি।

২০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Beteille, A : *The Idea of Natural Inequality and Other Essays*, Delhi : Oxford University, 1983

Rao, M. S. A. : *Social Movement and Social Transformation : A study of Tow Backward Class Movements in India, Delhi.*

Sarkar, Sumit : *Modern India : 1885-1945*, Delhi : Macmillan, 1983.

Singh, Yogendra : *Social Stratification and Social Change in India*, Delhi : Manohar, 1977.

Srinivas, M. N. : *Caste in Modern India and other Essays*, 1962. Asia Publishing House.

২০.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) জাতপাত সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রথাগত ব্যবস্থা। ব্যবস্থা হিসেবে জাতপাত বৈষম্যবাদী। বংশ অথবা আরোপিত সামাজিক মর্যাদা, বিশুদ্ধতা ও কলুষতার ধারণা এবং জীবিকার বিশেষীকরণের ভিত্তিতে একে সমর্থন জানানো হয়।

২) হ্যাঁ

৩) হ্যাঁ

৪) এটি এখানকার জনগণের মধ্যে জাতপাতগত অযোগ্যতাকে স্থায়িত্ব দিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজের বিখণ্ডিকরণ প্রক্রিয়াকেও স্থায়িত্ব দিত।

অনুশীলনী ২

১) এটি তপশীলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য বিধানসভায় ও সংসদে আসন সংরক্ষণ, সরকারী চাকরী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকার সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে সংরক্ষণধর্মী বৈষম্যের ব্যবস্থা করেছিল।

২) এগুলি ন্যায়সঙ্গত নাগরিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক,, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দাবীগুলিকে উত্থাপিত করে।

৩) হ্যাঁ।

৪) সংবিধান প্রণয়ন, নির্বাচনী রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, যোজনা এবং সংস্কার আন্দোলন জাতপাত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে।

অনুশীলনী ৩

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) আদিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে।

৪) না।

৫) আদিবাসী কৃষকদের প্রধান সমস্যাগুলি হ'ল ভূমি-বিচ্ছিন্নতা, ভূমিহীনতা, ঋণগ্রস্ততা, দাস-মজুরত্ব, কেবল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চাষবাস এবং প্রযুক্তির পশ্চাৎপদতা।

অনুশীলনী ৪

১) এটি আদিবাসী সাংস্কৃতিক রীতি হরণের প্রক্রিয়া।

২) না।

৩) সংরক্ষণবাদী, আত্তীকরণবাদী ও সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী।

৪) না।

৫) (ক) তাদের নিজস্ব ধারায় উন্নতি।

(খ) বরিষ্ঠ জনগণের গৃহীত নীতি প্রয়োগ নয়।

(গ) তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

(ঘ) কোন অতি-প্রশাসন নয়।

(ঙ) মানব-চরিত্রের গুণগত উৎকর্ষের ভিত্তিতে ফলাফল বিচার করা।

একক ২১ ❑ জাতীয় ঐক্যের সমস্যা : আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা

গঠন

২১.০ উদ্দেশ্য

২১.১ প্রস্তাবনা

২১.২ অঞ্চল এবং আঞ্চলিকীকরণ

২১.৩ ঔপনিবেশিক বিকৃতিসমূহ এবং আঞ্চলিক গঠন

২১.৩.১ ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির চিত্র

২১.৩.২ ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পের বিকাশ

২১.৪ স্বাধীনতার পর কৃষি বিকাশের পরিবর্তনশীল আঞ্চলিক ধারা

২১.৫ স্বাধীনতার পর শিল্পের বিকাশ এবং অঞ্চলসমূহ

২১.৬ অগ্রগতির হার এবং আঞ্চলিক বিকাশ

২১.৭ আঞ্চলিক বিকাশের ভারসাম্য রক্ষার উপাদান

২১.৮ পরিকল্পিত বিকাশ, আঞ্চলিক বিশেষীকরণ এবং ক্ষেত্রগত নির্ভরশীলতা

২১.৯ সারাংশ

২১.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২১.১২ উত্তরমালা

২১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জাতীয় ঐক্যের কিছু কিছু সমস্যা এই সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে উত্থিত হয়, যা আবার আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে - যেখানে দেশের কোন কোন অঞ্চল অন্য অঞ্চলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এককটি পাঠ করলে আপনি ভারতে আঞ্চলিক বিকাশের সমস্যা এবং নীচে উল্লেখিত বৈশিষ্টগুলিকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন :

- একটি ধারণা হিসেবে 'অঞ্চল'।
- ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং আঞ্চলিক গঠন।
- কৃষি ও শিল্পে আঞ্চলিকীকরণের পরিবর্তনের ধারা।
- সুসমঞ্জস্য আঞ্চলিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনা।

২১.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি আপনাকে ভারতে আঞ্চলিক বিকাশের সমস্যা ও স্তর সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেবে। আঞ্চলিক বৈষম্য আমাদের জাতি গঠনের অসমাপ্ত কাজের পরিণতি। এগুলি একান্তভাবেই প্রতিফলিত করে স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের বিকাশের জন্য গৃহীত নীতির অপর্যাপ্ততাকে এবং ঔপনিবেশিক শাসন যেসব বিকৃতি ঘটিয়েছিল সেগুলি সংশোধন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাকে। এই সমস্য ভয়ঙ্কর মাত্রা পেয়েছে এবং জাতি রাষ্ট্রের মূলেই আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। সেজন্য এটি দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আঞ্চলিকীকরণের ধারাকে আরও ভালভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তাকে, আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার প্রকৃতিকে এবং সময় জুড়ে তাদের পরিবর্তনশীল গঠনকে।

২১.২ অঞ্চল এবং আঞ্চলিকীকরণ

ডাডলে স্ট্যাম্প, পিথাওয়ালা এবং কুরিয়ান ছাড়া চল্লিশের শেষ অবধি ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের উপর খুব বেশী কাজ হয়নি। অবশ্য বিখ্যাত অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক আর. সি. দত্ত ব্রিটিশ ভারতের ভূমিব্যবস্থার আঞ্চলিক পার্থক্যের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন — যেমন পূর্বভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দক্ষিণ ভারতে অস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি। ব্রিটিশরা তাদের 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' নীতি অনুসরণ করে বাংলাকে রাজনৈতিক কারণে ভাগ করতে চেয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের মূল ভাবটি, যা অংশত উত্থিত হয় সফল বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সেটি নতুন শক্তিসঞ্চয় করে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ধারণার মধ্যে। ফলে পরবর্তীকালে,,যদিও ভারতের সংবিধান গড়ে ওঠে ভারত সরকারের আইন ১৯৩৫-কে অবলম্বন করে, যার ভিত্তিতে স্থাপিত হয় আঞ্চলিক সরকারের গঠন, আঞ্চলিকীকরণ এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যের প্রশ্ন পিছনে চলে যায়।

যাই হোক, দেশের মধ্যেকার আর্থ-সামাজিক পার্থক্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করে এবং রাজ্য পুর্নগঠন নিগম এই বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। তবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে এবং নির্বাচিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে কেন্দ্রীভূত করে অর্থনীতির অগ্রগতির হারের দ্রুত বৃদ্ধি করা। এর কাজ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে প্রাপ্ত শহরের শিল্প পরিকাঠামোকে কাজে লাগানো।

মূলত গঠনতান্ত্রিক উপাদানের উপর নির্ভর করে পাঁচের দশকে নীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে কিছু আঞ্চলিক নকশা রচনা করা হয়। ভারতের আদমসুমারী (১৯৫১) প্রাকৃতিক অঞ্চলের ধারণার পুনঃপ্রবর্তন করে এবং পাঁচটি সম্ভাবনা পূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিত করে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠনগত ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদানের উপর নির্ভর করে একটি আঞ্চলিক প্রকল্প রচনা করে। ব্যক্তিগতভাবে অনেক গবেষক সচেষ্ট হন উক্ত উপায়ে আঞ্চলিকীকরণে। পাঁচের দশকের মধ্যবর্তী কাল থেকে কৃষি অঞ্চলের সীমানা নির্দ্ধারণে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এটা উল্লেখ্য যে, ভারতে আঞ্চলিকীকরণের প্রক্রিয়া মুলত পাঁচের দশকে ভূতত্ত্ববিদ্, ভূগোলবিদ্ এবং কৃষি বিশেষজ্ঞরাই শুরু করেন আঞ্চলিক উপাদানের নক্সা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে। কিন্তু নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়াতে হয় আঞ্চলিক মাত্রা পূর্ণমাত্রা অবজ্ঞা করা হয় — যেমন ১৯৫৬ সালের ঘোষিত শিল্প নীতিতে (যেখানে সম্পূর্ণভাগে আঞ্চলিক প্রেক্ষিতটি অনুপস্থিত ছিল), অথবা ভাষা এবং জনগোষ্ঠীগত উপাদানকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার প্রকাশ ঘটে ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনগঠন নিগমের প্রতিবেদনে। আঞ্চলিকীকরণের আর্থ-সামাজিক বিষয় উপযুক্ত গুরুত্বলাভ করেনি ভারতের আঞ্চলিকীকরণের গঠন পর্বে।

আঞ্চলিকীকরণ এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা সম্পর্কে অনুসন্ধান অর্থপূর্ণ আকারে আর্থ-সামাজিক মাত্রায় একীভূত করার প্রচেষ্টা শুরু হয় ছয়ের দশকের গোড়াতে। এক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের ভারতের আদমসুমারী কর্তৃক প্রকাশিত সেনগুপ্ত এবং স্পাস্যুকের (১৯৬১) **ভারতের অর্থনৈতিক আঞ্চলিকীকরণ**, একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ১৯৬২ সালে পরিকল্পনা কমিশন গবেষণা শুরু করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকে আর্থ-সামাজিক সূচকের দ্বারা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে। কমিশন কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য জনসংখ্যা, আয়, কর সংগ্রহের প্রচেষ্টা এবং উন্নয়নখাতে ব্যয় প্রভৃতি বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে, যা **গ্যাডগিল ফর্মূলা** নামে খ্যাত। এটির ভিত্তিও ছিল ,কটি পরোক্ষ আঞ্চলিকীকরণের ভাবনা। ১৯৬১ সালে জেলাগুলির আর্থ-সামাজিক বিকাশের স্তর নিরূপণের জন্য একটি বিস্তৃত গবেষণা করেন অশোক মিত্র (১৯৬১) এবং ভারতের আদমসুমারী এটিকে একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করে। তৃতীয় ও তার পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি এবং ছয়ের দশকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভাগের দ্বারা গৃহীত নানা কর্মসূচী দেশের মধ্যে এবং এক একটি রাজ্যের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যকে সরাসরি স্বীকার করে নেয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন দেখা দেয় উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবনে আঞ্চলিক মাত্রাটি বিবেচনা করার। সুতরাং, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় আঞ্চলিক মাত্রার গুরুত্ব বৃদ্ধি, অঞ্চল বিষয়ে গবেষণা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ নতুন মাত্রা ও গুরুত্ব লাভ করে। কৃষি সম্পর্কে জাতীয় নিগম (১৯৭৬) বিস্তারিতভাবে কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চল নিরূপণে সচেষ্ট হয়।

অনুশীলন ১

১) ভারতে 'অঞ্চল'কে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে —

(ক) কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতের নিরিখে।

(খ) কেবলমাত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার নিরিখে।

(গ) কেবলমাত্র ভাষার নিরিখে।

(ঘ) কেবলমাত্র শস্য-উৎপাদনের ধারার নিরিখে।

(ঙ) কেবলমাত্র শহরের জনসংখ্যার ঘনত্বের নিরিখে।

(চ) পূর্বোক্ত সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে এবং অন্য কতকগুলি আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসহ, যেমন, জমির মালিকানার বন্টন, ব্যাঙ্ক-ঋণের সহজলভ্যতা, ভূমিহীনতার উপস্থিতি, উপজাতিদের উপস্থিতি ইত্যাদি।

আপনি উপরোক্ত ছয়টি বিকল্প উত্তরের মধ্যে যেটিকে সঠিক বলে মনে করেন সেটিকে (✓) চিহ্ন দিন। আপনার পছন্দ করা উতরটি যে সঠিক তার সমর্থনে চারটি বাক্য লিখুন। যদি আপনি মনে করেন যে, পূর্বোক্ত ছয়টি উত্তরের বাইরে কোন উত্তর আছে, তাহলে সেই উত্তরটিও যুক্তিসহ লিখতে পারেন।

....

....

....

....

২১.৩ ঔপনিবেশিক বিকৃতিসমূহ এবং আঞ্চলিক গঠন

২১.৩.১ ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির চিত্র

ভারতবর্ষের বিশাল পলিজ সমভূমি এবং সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই এই দেশ অন্যতম মুখ্য কৃষি অঞ্চল হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা এবং মৌসুমী বায়ুর খামখেয়েলীপনা-জনিত সমস্যা মোবিলার জন্য বাঁধ, পুকুর এবং কুয়োর সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা সুদূর অতীতকাল থেকেই এখানে চলে আসছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে সভ্যতার বিকাশ ঘটে মূলত কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের ফলে। সেজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমসাময়িক অগ্রগতির মানদণ্ডে ভারতবর্ষকে একটি যথার্থ উন্নত কৃষিক্ষেত্র হিসেবে দখল করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে কেমনভাবে প্রভাবিত করেছিল ? প্রথমত, এই ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল কাজের লোকের আনুপাতিক হার বিবর্ধিত হচ্ছিল; দ্বিতীয়ত, চাষের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল এক বৃদ্ধাবস্থা। তৃতীয়ত, ভূমি এবং সেচ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রান্তিক; এবং পরিশেষে, কৃষি উৎপাদনের দায়িত্ব ক্রমাগত স্থানান্তরিত হচ্ছিল তাদের উপর, যারা জমির প্রকৃত মালিক ছিল না। এই সমস্ত ঘটনা লক্ষণীয়ভাবে জমি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করে। কৃষিক্ষেত্রে এই সমস্ত উপাদানের কু-প্রভাব দেশে সব অঞ্চলে অবশ্য এরকম ছিল না। ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির উৎপাদনশীলতাকে কেন্দ্র করে উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে ক্রমাগত পার্থক্য বেড়ে চলেছিল। প্রথমোক্ত অঞ্চলে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেলেও পূর্বাঞ্চল কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত বিশ্রীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কলকাতাকে শীর্ষে রেখে পূর্ব ভারতে রেল লাইন তৈরির কাজে মোটা টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সেচের জন্য অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তাছাড়া, সামঞ্জস্যহীনভাবে অত্যন্ত অল্প অর্থ, যা সেচের কাজে ব্যয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকে, ব্যয়িত হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পনের বছরে, সেচের কাজে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মিলিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচ শতাংশ, অপরদিকে পাঞ্জাবে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সাধারণভাবে চল্লিশ শতাংশের উপর। ফলে স্বাধীনতার সময়ে ভারতবর্ষ উত্তরাধিকার হিসেবে পেল একটি অচল ও প্রকটভাবে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীন কৃষিক্ষেত্র।

২১.৩.২ ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পের বিকাশ

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের শিল্পের ভিত্তি রচিত হয়। এই প্রারম্ভিক সময়ে শিল্পক্ষেত্রে গভীরভাবে নিহিত ছিল যে দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা, তাই পরবর্তীকালে, এমনকি সমসাময়িক ভারতে, শিল্পের ধারাতে, বিশেষ করে তার আঞ্চলিক প্রেক্ষিতকে, ক্রমাগত প্রভাবিত করে।

ব্রিটিশ শক্তি পৃথিবীর আপেক্ষিকভাবে অন্যতম উন্নত শিল্প-অর্থনীতির অধিকারী হয় যখন তাঁরা ভারতবর্ষকে জয় করে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে। ভারতীয় শিল্প নিগম (১৯১৬-১৮) এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, "যখন ব্যবসায়ী অভিযানকারীরা পশ্চিমী দেশ থেকে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তখন এই দেশের শিল্পায়ন কোনও অংশে অগ্রবর্তী ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ে ছিল না।"

ইতিহাসের ঐতিহ্যের নিরিখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশ কেবল হস্তশিল্পে এবং কৃৎকৌশলেই সমৃদ্ধশালী ছিল না; শিল্পসম্পদের ক্ষেত্রেও এটি ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ। ভারতীয় শিল্প নিগম এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, 'খনিজ সম্পদে এই দেশ প্রধান প্রধান শিল্পের চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল।' এই কথা তথাকথিত তদানীন্তন অনেক উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও বলা যেত না।

কেমন করে ব্রিটিশরা তাঁদের এই উপনিবেশের সমৃদ্ধ শিল্পধারার উত্তরাধিকার এবং অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাল ? তারা প্রাচীন ও মধ্য যুগের কৃষি-শিল্প সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে 'ইংল্যান্ডের একটি কৃষিকার্যে' রূপান্তরিত করে। সরকারের শিল্পনীতি, বিশেষ করে প্রাক্ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ পর্যায়ে, ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শ্রেণীর নির্দেশমত ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহের উপাঙ্গে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে রূপান্তরিত করে। ফলে ভারতবর্ষে বি-শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

ঔপনিবেশিক যুগে শিল্পের অগ্রগতির জন্য গৃহীত প্রক্রিয়া ছিল দুর্বল এবং ভোগ্যদ্রব্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এই প্রক্রিয়া অগ্রগতিকে বিপরীতমুখী করে। মূলধনীদ্রব্যের ক্ষেত্রের অনুপস্থিতির ফলে যা ইউরোপীয় জাতিগুলিকে স্ব-নির্ভর শিল্পায়নের পথে এগোতে সাহায্য করেছিল, এদেশের শিল্প কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও ব্রিটিশরা জেনেভা সম্মেলনে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর একটি অন্যতম 'শিল্পোন্নত দেশ' বলে বর্ণনা করে, বস্তুত এটি ছিল মাটির পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক অতিকায় মূর্তির মত।

ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে প্রচেষ্টা গহীত হয় তা কেবল গঠনগতভাবে বিপরীতমুখী ছিল না, আঞ্চলিকভাবে বিকৃতও ছিল। প্রাচীন, বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলি যেমন — সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং ছোট ও মাঝারি বহু শহর যেগুলি আধুনিক শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের কেন্দ্র হতে পারত সেগুলি দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। একটি মাথাভারি জায়গা দখলকারী ক্রমোচ্চ ব্যবস্থায় বন্দর-শহর যেমন- কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ শীর্ষ বন্দর-শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অল্প কিছু অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের স্থাপন করা হয় বন্দর সংলগ্ন এলাকায় এবং ছোট ছোট শহরে। সেগুলি গড়ে উঠেছিল বন্দর-শহরের লেজুড় হিসেবে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্পে নিম্নমুখী অংশগ্রহণের উপরে বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। তাছাড়া, তৎকালীন রাজ্যগুলি এই সীমিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল।

এক বন্দরভিত্তিক বিকেন্দ্রীমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা যা ছিল মূলত রেল-নির্ভর, গড়ে তোলা হ'ল বিস্ময়কর ব্যয়ে। ফলে, বন্দর-নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শিল্পায়নের এক ধরনের অবরুদ্ধ ঘাঁটি। সেজন্য দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্প-মানচিত্রে সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত; অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শিল্পে এবং পরিবহণে যে নতুন উন্নয়ন ঘটে সেগুলি ছিল খুবই স্থানীয় এবং এর প্রভাব সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে ছিল খুবই প্রান্তিক। একে বলা হয় অবরুদ্ধ ঘাঁটির ধাঁচের উন্নয়ন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলিতে, যেখানে পূর্বোক্ত বন্দর-শহর ছিল, শিল্পক্ষেত্রের কর্মীবাহিনীর এবং দেশের উৎপাদনের সত্তর ভাগের বেশী অংশ ছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং ও বৈদ্যুতিক পণ্য এবং রসায়ন শিল্পে মোট উৎপাদনে এই সমস্ত রাজ্যের অংশ ছিল যথাক্রমে ৮৩ শতাংশ এবং ৮৭ শতাংশেরও বেশী। অপরদিকে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের মোট শিল্পক্ষেত্রে কর্মী বাহিনী যোগানের অংশ ছিল কুড়ি শতাংশেরও নীচে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ নীতি শিল্পায়নের পদ্ধতিকে পরিমাণগতভাবে দুর্বল করে এবং এবং গঠনগতভাবে করে তোলে বিপরীতমুখী, কারণ একটি গড়ে ওঠে মূলত

অপর্যাপ্তভাবে গড়ে ওঠা মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে। তাছাড়া, এটি খনিজ সম্পদে ভরপুর মধ্যপ্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা, কর্নাটক প্রভৃতি অঞ্চল অধরা রাখে। পক্ষান্তরে, শিল্পোন্নত কিছু অঞ্চল, যেগুলি পারদর্শী হয়ে ওঠে কিছু মূল প্রক্রিয়াকরণ এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন শিল্পে, সেগুলি দ্বীপের মত গড়ে ওঠে বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করে।

অনুশীলনী ২

১) ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক গঠনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি দেখা যায়—

(ক) উত্তর-পশ্চিম এবং ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাঞ্চলের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের পার্থক্য বর্ধিত হয়।

(খ) রেলপথ গড়ে ওঠে কোলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজের মত মুখ্য বন্দরগুলির সঙ্গে তাদের পশ্চাদ-প্রদেশের যোগাযোগ ঘটাবার জন্য।

(গ) রেলপথ উন্নয়নের জন্য সেচের ক্ষতি করে মোটা টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

আপনি কি মনে করেন এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দেশের ইতিবাক উন্নয়নের সহায়ক ছিল ? যদি বলেন - না, তাহলে কেন ? তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার উত্তর দু'টি বাক্যে লিখুন।

....

....

২১.৪ স্বাধীনতার পর কৃষি বিকাশের পবির্তনশীল আঞ্চলিক ধারা

ভারতীয় অর্থনীতির কৃষিক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। পাঁচের দশকে কৃষিক্ষেত্রে যে সংস্কার সাধন করা হয় তা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে এবং ব্যাপকভাবে কৃৎকৌশলগত উপাদান ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করে। এর ফলে পরিবেশগত বাধা দুর্বল হয়ে পড়ে। পাঁচের দশকে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের অগ্রগতির পৌনঃপুনিক হার ছিল তিন শতাংশের বেশী, ষাটের দশকে এই হার কমে দাঁড়ায় প্রায় আড়াই শতাংশে। সাতের দশকে এই বৃদ্ধির হার আরও কমে দাঁড়ায় দুই শতাংশের নীচে। আটের দশকে এই বৃদ্ধির হার ক্রমশ উর্ধমুখী হয়, তবে এই বৃদ্ধি হয় খুবই অস্থায়ী, কারণ বছর বছর ফসলের উৎপাদনের তারতম্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। বৃদ্ধির হার বেশী অস্থায়ী হয় সেই সমস্ত অঞ্চলে, যেখানে কুয়ো এবং পুকুরের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কৃৎকৌশলগত উপাদানের ব্যবহারের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজমির আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেক্টর পিছু বিস্ময়করভাবে ট্র্যাক্টরের সংখ্যা, টিউবওয়েলের সংখ্যা, সার ব্যবহারের পরিমাণ প্রভৃতির বৃদ্ধি ঘটেছে। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, অন্যান্য প্রাথমিক ক্ষেত্রের সঙ্গে একত্রে কৃষিক্ষেত্রের জাতীয় আয়ে অবদান কমতে থাকে। পাঁচের দশকে অবদানের পরিমাণ ছিল প্রায় ষাট শতাংশ, আটের দশকে তা দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ শতাংশের নীচে। অনুরূপভাবে, শ্রমশক্তির গঠনে কোন রূপান্তর দেখা যায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় সম্পদে কৃষির অবদান কালক্রমে কমতে থাকে, তবে জনসংখ্যার যে অংশ এর সঙ্গে যুক্ত তাদের সংখ্যা কমবেশী একই থাকে। সাম্প্রতিক আদমসুমারী (১৯৮১) এবং জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (২৩তম, ৩২তম এবং ৩৮তম) প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সাতের দশকের শেষ ভাগ থেকে আটের দশকের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কৃষির উপর নির্ভর মানুষের সংখ্যার প্রান্তিক হ্রাস ঘটেছে। যাই হোক, জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান প্রচণ্ডভাবে কমে গেছে যার ফলে কৃষি-শ্রমিকের এবং অ-কৃষি শ্রমিকের

উৎপাদনশীলতার পার্থক্য বেশী করে নজরে পড়ে। এটি নিশ্চিতভাবে গ্রাম-শহরের বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিশেষ করে ছয়ের দশক থেকে, সম্ভব হয়েছে মূলতঃ কৃৎকৌশলগত উপাদানের মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, যেমন বীজ, সার, বস্ত্র ইত্যাদি। পাঁচের দশকে আবার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল মূলতঃ কৃষি জমির আয়তন বাড়ার মাধ্যমে। সরকারের তরফে অতি সচেতনভাবে 'সম্ভাবনাময়' কিছু জেলা বেছে নিয়ে সীমিত মূলধন নিয়োগ করা হয় খাদ্য সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ সমস্ত জেলায় জমি এবং কৃষি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঐ জেলাগুলির সঙ্গে মূলতঃ পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাডুর কিছু অংশ, সমুদ্র তীরবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দেশের অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে বেড়ে যায়।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং একটি রাজ্যের মধ্যে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার বৈষম্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বিভিন্ন গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা স্থাপিত ওয়ার্কিং গ্রুপ তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য (পরিবর্তনশীলতার সহগ দ্বারা পরিমাপ করা হয়) ১৯৬১ এবং ১৯৮১ সালের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে।

'সবুজ বিপ্লব' ধারণাটির সাহায্যে ছয়ের দশকের প্রথম দিক থেকে সাতের দশকরে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিকে বোঝায় যা মূলতঃ সার-বীজ, সেচ-ট্র্যাক্টর প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ঘটে। এটি অবশ্য ঘটেছিল কিছু অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। ৪৯তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় যে সতেরটি অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রের তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ চাষের এলাকায় ১৯৬২-৭৫ সালের মধ্য উৎপাদনের পরিবর্তন হয় নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক হলেও অগ্রগতির হার অত্যন্ত কম, অর্থাৎ, বৎসরে হেক্টর পিছু মাত্র ১০ টাকা। অন্যান্য বহু অঞ্চলে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা নিম্নমুখী হয় সাতাশটি অঞ্চলে, যা চাষের এলাকার পঞ্চাশ শতাংশের বেশী ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলকে একত্রে বলা হয় দেশের 'ক্ষুধার্ত উদর'। যার বিস্তার ছিল চতুর্দিকে, উত্তরে উত্তরপ্রদেশের হিমালয় থেকে দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে থর মরুভূমি থেকে পূর্বে উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত। সাতের দশকের প্রথম দিকে যে চৌদ্দটি অঞ্চল জমির অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য খ্যাত ছিল সেখানে সারা দেশের যথাক্রমে ৪৪, ৫০ এবং ৬০ শতাংশ সার, টিউবওয়েল এবং ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা হয় দেশের ২০ শতাংশ জমিতে ৩৬ শতাংশ ফসল উৎপাদনের জন্য। হেক্টর পিছু সার, টিউবওয়েল এবং ট্র্যাক্টরের ব্যবহারের হার ছিল আরো বেশী। যেহেতু উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি সম্ভাবনাময় অঞ্চলে উৎপাদনের হারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধির জন্য কৃৎকৌশলগত উপাদানের ব্যবহারকে নিবিড় করা, এই পরিবর্তন ধনী ও গরীব অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য আরো বাড়িয়ে তোলে।

২১.৫ স্বাধীনতার পর শিল্পের বিকাশ এবং অঞ্চলসমূহ

দেশে ব্যাপকভাবে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পাঁচের দশকে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের বার্ষিক হার ছিল ছয় শতাংশ। এই হার মোট জাতীয় উৎপাদনের গড় ব্যয়ের থেকে বেশী ছিল। এই হার ছিল ৩.৫%, ছয়ের দশকের প্রথম দিকে কল-কারখানাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় — বার্ষিক হার ছিল আট শতাংশের বেশী। ১৯৬৫-৬৬ সালে বৃদ্ধির হার এক শতাংশ কমে যায় এবং এই ক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরগুলিতে প্রকৃত অর্থে এই হার কমতে থাকে। পরে আর কোন সময়ে

ছয়ের দশকের প্রথমের মত, এমনকি পাঁচের দশকের মত উৎপাদনের হার বাড়েনি। আটের দশকে অবশ্য ক্রমশঃ শিল্পক্ষেত্রে তথা সমগ্র অর্থব্যবস্থায় অগ্রগতি দেখা যায়।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্পক্ষেত্রে যে পশ্চাদ্‌গমন দেখা যায়, ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দা সূচিত করে, তার ফলে আঞ্চলিক স্তরে শিল্পের প্রসারের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়।

ভারতে পরিকল্পনায় প্রথম শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির বৈষম্য বড় হয়ে দেখা দেয়। পাঁচের দশক শিল্পে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অসাম্য বৃদ্ধির কাল হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণায় জাতীয় পরিষদ যে তথ্য উপস্থাপন করে তাতে দেখা যায় যে, রাজ্যে রাজ্যে গৌণ ক্ষেত্র থেকে মাথাপিছু আয়ের ভেদাঙ্ক ১৯৫০-৫১ সালে ৫০ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৬০-৬১ সালে। তবে ঐ গবেষণায় উপসংহারে বলা হয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে এই অবস্থা থাকলেও পরে রাজ্যে রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে বৈষম্য ক্রমাগত কমতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যুরো যেসব তথ্য প্রকাশ করে, যা ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদের মূল্যায়নকে সমর্থন করে, তাতে দেখা যায় যে, ১৯৬০-৬১ সালের বৈষম্যের সূচক ৫৮ শতাংশ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৪৭ শতাংশে নেমে আসে।

আবাসন এবং শহর উন্নয়ন (১৯৮৩) সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যে টাস্ক ফোর্স গঠন করে তার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজ্যে রাজ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে শিল্পক্ষেত্রের দ্বারা সৃষ্ট মাথাপিছু মূল্যের অসাম্য ১৯৬১-৮১ কালপর্বে কমে আসে। ১৯৬০-৬১ সালে ভেদাঙ্ক ছিল ৯২ শতাংশ যা ১৯৭০-৭১ সালে কমে হয় ৬৭ শতাংশ। ১৯৮০-৮১ সালে এটি হয় মাত্র ৬২ শতাংশ। শিল্পপিছু উৎপাদন, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের অংশ, অ-গৃহ শিল্পে শ্রমের সমানুপাতিক পরিমাণ, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট অথবা উক্ত ক্ষেত্রে প্রতি হাজার নিয়োগ, ইত্যাদি সূচক এই তথ্য উদঘাটন করে যে, রাজ্যগুলির অসাম্য, যা ১৯৫১-৬১ কালপর্বে বৃদ্ধি পায়, পরবর্তী দশকগুলিকে কমতে থাকে বা স্থির থাকে।

যাই হোক্, ১৯৭৩-৭৮ কালপর্বে শিল্পের স্থানিক ও ক্ষেত্রগত পরিবর্তন শিল্পের বাৎসরিক সমীক্ষাতে উল্লেখিত হয়েছে। একটি গবেষণা প্রমাণ করে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্যের হ্রাসকে একেবারে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। এটি আরও প্রমাণ করে যে, উপরের দিকের তিনটি রাজ্যের মোট শিল্পের সংখ্যা, উৎপাদন এবং স্থায়ী মূলধন একত্রে বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেই নিম্নমুখী; অপরদিকে, উপরের দিকের নয়টি রাজ্যের অংশ প্রান্তিকভাবে উর্দ্ধমুখী হ'তে দেখা যায়। অতি সম্প্রতি বাৎসরিক শিল্প-সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিল্পের আঞ্চলিক বিকীর্ণতার তত্ত্বটি সঠিক নয়। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যেটা দেখা যায় সেটা হ'ল মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার আপেক্ষিক পরিবর্তন। এর কারণ বম্বে ও কলকাতাতে শিল্পের কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ার হারের নিম্নগামীতা। জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং আরও বহু জিনিষের অভাব, যা শিল্পের কেন্দ্রীভবনের অনুকূল নয়, এই নিম্নগামীতার জন্য দায়ী। বিদ্যুতের ঘাটতি, শ্রম ও আনুষঙ্গিক বস্তুর অভাবের জন্য সাতের দশকের প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে এই অবস্থা দেখা যায়। এর জন্য সরকারে শিল্প বিকীর্ণতার নীতি দায়ী নয়।

আন্তঃরাজ্য বৈষম্য হ্রাসের জন্য শহর উন্নয়নের নীতি দায়ী। এই নীতি প্রায় সব রাজ্যে স্বাধীনতার পর অনুসরণ করা হয়। রাজ্য-রাজধানীতে এবং আরও কয়েকটি কেন্দ্রে রাজ্য সরকারগুলি উচ্চস্তরের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং শহরের সুযোগ-সুবিধা দিতে এগিয়ে আসে। অতিমাত্রায় ভরতুকি প্রদত্ত এইসব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য প্রবীণ আমলা, পেশাজীবী মানুষ, শিল্পোদ্যোগী মানুষ এবং দক্ষ শ্রমিক ঐ সমস্ত স্থানে জড়ো হয়। সরকার নিজের বিভাগের মাধ্যমে

সরাসরি অথবা বিভিন্ন নিগমের মাধ্যমে ঐ সব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই সরকারী কোষাগার থেকে আসে। কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের যোগান থাকায় পুরসভাগুলি বেশি করে নাগরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে পরে অন্যান্য ছোট শহরের তুলনায়। সুতরাং, এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি ভরতুকিপ্রাপ্ত পরিকাঠামো এবং পরিষেবা লাভ করে যা অনুন্নত এলাকায় মূলধন-ভরতুকি ও অন্যান্য উৎসাহ প্রদানকারী সাহায্যকে ছাড়িয়ে যায়। শিল্পপতিরা সেজন্য শহরের মধ্যে অথবা আশপাশে শিল্প স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়। এটি তাঁদের বিভিন্ন বিভাগের আর্থিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের সাহায্য করে, যেহেতু এগুলি শহরে অবস্থিত। পরিশেষে, এই ব্যবস্থা তাঁদেরকে তাঁদের কারখানার জন্য দক্ষ শ্রমিক, প্রশাসক প্রভৃতি পেতে সাহায্য করে, কারণ, দক্ষ শ্রমিক, প্রশাসক প্রভৃতি ভাল বাসস্থানের পরিমণ্ডলের দ্বারা আকৃষ্ট হন, যা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য শহরের কিছু কিছু অংশে তৈরি হয়েছে।

২১.৬ অগ্রগতির হার এবং আঞ্চলিক বিকাশ

আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার পরিবর্তনীয় কাঠামো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বিকাশের মোট সাফল্যের মানদণ্ডে, যা প্রকাশিত হয় মাথাপিছু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (এস. ডি. পি) বা অন্যান্য মোট হিসেবের মানদণ্ডে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে একটি গবেষণায় পাঁচের দশকের ভারতে আন্তঃরাজ্য বৈষম্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং এতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় ঐ দশকের গোড়ায় শুরু হয়, যার বৈশিষ্ট্য ছিল স্থাপিত ভারসাম্যহীনতার বৃদ্ধি। এতে দাবী করা হয় যে জাতীয় বিকাশ এবং আঞ্চলিক বৈষম্য উল্টান U-এর মত বঙ্কিমভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। এটি পরোক্ষভাবে এই ইঙ্গিত দেয় এই প্রাথমিক পর্বের পর ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা সম্ভবত হ্রাস পাবে।

এই সিদ্ধান্তসমূহকে অর একদল গবেষক চ্যালেঞ্জ করেন এবং বলেন যে, আন্তঃরাজ্য বৈষম্য পাঁচের দশকে কমে আসে। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ল যে, গবেষকরা প্রায় সকলে একমত হন যে, তাঁদের সে বৈষম্য কমেনি বরং পরবর্তী দশকগুলিতে বির্বর্ধিত হয়েছে। বিশেষ করে সাতের দশকে বৈষম্য অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করে। পরিকল্পনায় কমিশনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স আবাসন এবং নগর উন্নয়নের উপর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, মাথাপিছু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (এস. ডি. পি)-এর পরিবর্তনীয়ের সঙ্গে ১৯৬১ সালে ২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭১ সালে ২৬ শতাংশ হয়। ১৯৮১ সালে এটি বেড়ে হয় ৩৩ শতাংশ।

সামগ্রিক উন্নয়নের পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে মাথাপিছু আয়ের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে গবেষকরা সচেষ্ট হন অধিক সংখ্যক সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকের সাহায্যে উন্নয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়া পরিমাপের। তথ্যনির্ভর এই বিশ্লেষণও প্রমাণ করে যে, ছয়ের দশকের পর থেকে আন্তঃরাজ্য বৈষম্য কমেনি। এটা লক্ষণীয় যে, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার সূচক, যেমন — বৈদ্যুতিক সংযোগপ্রাপ্ত গ্রামের হিসেব, সাক্ষরতার হার, বিদ্যালয়ের যাওয়ার হার, ব্যাঙ্ক এবং প্রতি হাজারে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, আন্তঃরাজ্য বৈষম্য প্রান্তিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সামগ্রিক অগ্রগতির ভারসাম্যহীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ যা মাথাপিছু এস. ডি. পি. কৃষি অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসমতা বৃদ্ধিকে অংশতঃ ব্যাখ্যা করে। এটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন — সেচের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সেচ-সেবিত এলাকার সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন, সারের ব্যবহার, ট্র্যাক্টরের ব্যবহার ইত্যাদি, প্রতি হেক্টরেও আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে ছয়ের এবং সাতের